অধিকারহারা জনগণের মুখপত্র

জাতীয় বার্তা

সত্য অন্বেষণে নিবেদিত

১ম বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা ॥ ১ ফেব্রুয়ারী ২০১০ ॥ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ ॥ শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা

সওয়াল জবাব

গত ১২ জানুয়ারী রাঙ্গুনিয়ায় সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রথম মাজার জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিএনপির নির্বাহী কমিটির ধর্ম বিষয়ক সহসম্পাদক দীপেন দেওয়ান:
"পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত সব পাহাড়ি বাঙ্গালির মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে বিএনপি।"
বাহ! বাহ! শান্তিবাদী! এই না হলে লোকে চিনবে কী করে! আশির দশকে সুবিমল দেওয়ানদের মত চামচাদের যোগসাজশে জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটলার ঢুকিয়েছিলেন। খালেদা জিয়া এখনও ঢাকার বস্তিবাসীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের দাবি তোলেন। জঙ্গিপিরি ছেড়ে অসমাপ্ত পিতৃ-দায়িত্ব পালন ও "শহীদ জিয়ার স্বপ্ন" বাস্তবায়নে নেমেছেন দীপেন দেওয়ান।

লক্ষ্মীছড়িতে সেনা সৃষ্ট বোরখা বাহিনীর সন্ত্রাস

॥ লক্ষ্মীছড়ি প্রতিনিধি ॥

লক্ষ্মীছড়িতে সেনা সৃষ্ট বোরখা বাহিনী সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে এলাকার জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। লক্ষ্মীছড়ি জোন কমান্ডার লেঃ কর্নেল শরীফুল ইসলামের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম করে যাচ্ছে।
নিচে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হল:

৩০ জানুয়ারী বিকেল ৩টার দিকে বোরখা পার্টির সদস্যরা লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাগরিকা চাকমার স্বামী রত্ন সেন চাকমাকে স্টেশন থেকে অপহরণ করে।

২৯ জানুয়ারী রাতে কপিল সেন চাকমা, ফরাচন চাকমা ও নির্মল কান্তি চাকমার নেতৃত্বে একদল বোরখা পার্টির সন্ত্রাসী দুল্যাতলী ইউনিয়নের হাজাছড়ি মাষ্টার পাড়া থেকে ইউপিডিএফ কর্মি রসিক চন্দ্র চাকমা ওরফে আগুতকে (২০) অপহরণ করে। সে মাষ্টারপাড়া বৌদ্ধ বিহারে মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গিয়েছিলো। সেখান থেকেই তাকে অপহরণ করা হয়।

গত ১৭ জানুয়ারী সকাল আনুমানিক ৮:৩০টায় অপহরণের শিকার হন ২য় পাতায় দেখুন

বোরখা পার্টির বিরুদ্ধে বান্যাছোলা গ্রামবাসীদের প্রতিরোধ

বান্যাছোলা গ্রামের জনগণ সেনা-সৃষ্ট সন্ত্রাসী বাহিনী বোরখা পার্টির সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন বলে জানা গেছে।

৩১ জানুয়ারী লক্ষ্মিছড়ি থানায় এ মামলা করা হয়। জানা যায়, বোরখা পার্টি ৩০ জানুয়ারী তাদের ডাকা একটি সভায় যোগদানের জন্য বান্যাছোলা গ্রামের লোকজনকে নির্দেশ দেয়। কিন্তু গ্রামবাসীরা তাদের নির্দেশ অমান্য করে। তাদের কেউ বোরখাদের ঐ সভায় যোগ দেননি। এ জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে বোরখা পার্টির সদস্যরা ৩১ জানুয়ারী বান্যাছোলা গ্রামে গিয়ে লোকজনকে হুমকি ধামকি দিতে থাকে ও সকল গ্রামবাসীকে গ্রামবন্দী করার ঘোষণা দেয়। সন্ত্রাসীরা গ্রামের সমস্ত দোকান বন্ধ করার নির্দেশ দেয়, গাড়ি চালাতে বাধা প্রদান করে এবং গাড়ির চাবি তাদের হেফাজতে দেয়ার জন্য চাপ দেয়।

এই ঘটনার পর গ্রামবাসীরা সংগঠিত হয়ে বান্যাছোলা ক্যাম্পে বোরখাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় ও থানায় মামলা করে।

সাজেক সংবাদ

সেনা নির্যাতন ও তল্লাশি, নারীদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ

গত ২১ ডিসেম্বর '০৯ রাত আনুমানিক ১০টার সময় বাঘাইহাট জোন থেকে হাবিলদার তরিকুলের নেতৃত্বে ১০/১৫ জনের একদল সেনা বাঘাইহাট গুচ্ছগ্রামে হানা দেয়। সেনারা ঘরে ঘরে তল্লাশি চালায় এবং সুরকুমার চাকমাকে (৪০) কে মারধর করে। ফেরার সময় সেনারা সেখান থেকে ১০ জনকে ধরে নিয়ে যায়। তারা হলেন, ১. সুদর্শন চাকমা(৩৫), বাঘাইহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক লক্ষীমনি চাকমা, ও উজ্জ্বল চাকমা, প্রাক্তন মেম্বার, হৃদয় রঞ্জন চাকমা, গ্রামের কার্বারী চিত্ত রঞ্জন চাকমা, বিনয় চাকমা, মতিলাল চাকমা, জগদীশ চাকমা, নিরুপম চাকমা, আনন্দ চাকমা। সেনারা এই দশ ২য় পাতায় দেখুন

ধর্ষণ চেষ্টার প্রতিবাদে ঘিলাছড়িতে নারীদের উত্থান

এটা ছিল এক অভূতপূর্ব আন্দোলন। ঘিলাছড়ির নারীরা আগে এভাবে কখনো জেগে ওঠেনি। সকল ভয়ভীতি উপেক্ষা করে শত শত নারী হাতে লাঠি নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। বন্ধ করে দেয় রাঙ্গামাটি - খাগড়াছড়ি সংযোগ সড়ক। তাদের ভয়ে থর থর করে কেঁপেছে পুলিশ। অবরোধ অমান্য করলে সেনা কমান্ডারদের পিঠেও পড়েছে লাঠির আঘাত। শত চেষ্টা, ভয়ভীতি ও ষড়যন্ত্র করেও এই বীরাঙ্গনাদের আন্দোলন দমন করা যায়নি। চক্রান্ত করে গুজব রটিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া হয় সেটলারদের। ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রায় বেঁধে গিয়েছিল। কিন্তু তাতেও তারা দমেনি। সামরিক-বেসামরিক প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিরা দফায় দফায় আলোচনা করেও তাদের শান্ত করতে পারেনি। মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে তারা গলে যায়নি। ফলে আন্দোলনের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে।

যমুনা চাকমা ওরফে যুবনা নামে কৃষ্ণমাছড়া মোনপাড়া গ্রামের এক গৃহবধূকে ধর্ষণ প্রচেষ্টার প্রতিবাদে ঘিলাছড়ি নারীদের এই যুগান্তকারী উত্থান। ধর্ষণ প্রচেষ্টার ঘটনা ঘটে ৮ নভেম্বর। বাড়ির পাশের ছড়া থেকে পানি আনতে গেলে ঘিলাছড়ি ক্যাম্পের এক সেনা সদস্য তাকে ঝাপটে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। চিৎকার দিলে আশেপাশের লোকজন গিয়ে তাকে রক্ষা করে। সেনা সদস্যটি হাতে নাতে ধরা পড়ে। ঘটনার সংবাদ বিদ্যুৎবেগে পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে পরদিন সকাল থেকে শত শত নারী রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়। অবরোধকারীরা দোষী সেনা সদস্যকে শাস্তি প্রদান, ঘিলাছড়ি ক্যাম্প অপসারণ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী বাঙ্গালী নির্বিশেষে সকল নারীর ইজ্জত রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানের দাবি জানায়।

অবরোধ চলার সময় নান্যাচর উপজেলা চেয়ারম্যান প্রীতিময় চাকমা ও ইউএনও জহিরুল ইসলাম ঘিলাছড়ি এসে আন্দোলনকারীদের সাথে আলোচনায় মিলিত হন এবং অভিযুক্ত সেনা সদস্যকে সেনা আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানের লিখিত অঙ্গীকার করেন। লিখিত অঙ্গীকারনামায় তারা বলেন: "... উল্লেখিত ঘটনা(র) পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নিশ্চয়তা প্রদান করিতেছি উক্ত অভিযুক্ত আর্মী সদস্য স্বাক্ষী প্রমাণ সাপেক্ষে আর্মী আইনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করা হবে। আমরা আমরাও (আরও) অঙ্গীকার প্রদান করিতেছি যে তাহাদের দাবি অনুযায়ী স্বাক্ষী প্রমাণ সাপেক্ষে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে উক্ত অভিযুক্ত আর্মী সদস্যের শাস্তি প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।"

কিন্তু তাদের এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি জনগণের সামনে স্পষ্ট হতে খুব বেশী সময় লাগেনি। পরদিন অর্থাৎ ১০ নভেম্বর দোষী সেনা সদস্যকে সনাক্ত করার কথা থাকলেও প্রশাসন তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। এ ঘটনা আন্দোলনকারী নারীদেরকে আরো বেশী ক্ষুব্ধ করে তোলে। এদিন সহস্রাধিক পাহাড়ি নারী ঘিলাছড়িতে জড়ো হন এবং অনেকে সেনানিয়ন্ত্রিত পার্বত্য এলাকায় তাদের দুরাবস্থার কথা তুলে ধরে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। তাদের দাবিগুলো নতুন করে তুলে ধরেন।

লোকদেখানো কিছু পদক্ষেপ নিয়ে নারীদের আন্দোলন স্তব্ধ করে দেয়ারও চেষ্টা করা হয়। ১১ নভেম্বর রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নুরুল আলম চৌধুরীকে প্রধান করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবদুল আল ফারুক, রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিরুপা দেওয়ান, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা নির্মলেন্দু ত্রিপুরা ও জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তানজিলা বেগম। তিন দিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা ৭ম পাতায় দেখুন

ইউপিডিএফ-এর ১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত

"মুক্তির পথ আত্মনির্ভরশীলতা ও অধিকার আদায়ের একমাত্র হাতিয়ার নিজস্ব সংগঠন" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ২৬ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনরত আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর ১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে তিন জেলায় পার্টির সকল ইউনিটে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ইউপিডিএফ-এর পতাকা উত্তোলন ও বিপ্লবী ও গণসঙ্গীত পরিবেশন, আলোচনা, মত বিনিময় সভা ও চা চক্র, সাইকেল র‍্যালী, পার্টির ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে আর্থিক সাহায্য প্রদান, ফানুস ওড়ানো, ক্যাম্প ফায়ার ও শিশুদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা।

খাগড়াছড়িতে ২৫ ডিসেম্বর থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এদিন বেলা ২টায় মহাজন পাড়াস্থ সূর্যশিখা ক্লাবে শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, সন্ধ্যায় জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ফানুস উড়ানো ও এদোশিরা মোনে ক্যাম্প ফায়ারের আয়োজন করা হয়। ২৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় আনুষ্ঠানিকভাবে ২য় পাতায় দেখুন

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ১৮তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঢাকায় গত ২৬ - ২৭ জানুয়ারী পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ১৮তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলন শেষে অংপ্য মারমাকে সভাপতি, সুমেন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও থুইক্য চিং মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসটি সড়ক দ্বীপে অনুষ্ঠিত সম্মেলন উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. আকমল হোসেন।

তিনি পাহাড়ি জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের প্রতি তার সমর্থন ব্যক্ত করে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তাগুলোকে ধ্বংস করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালানো হচ্ছে ও তাদেরকে শিকড়চ্যুত করা হচ্ছে।

তিনি প্রাইমারী লেভেল পর্যন্ত জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

তিনি পাহাড়িদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিরসন হওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেন।

রিকো চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম, জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চের আহ্বায়ক মাসুদ খান, সংস্কৃতির নয়াসেতুর সিমন, প্রগতির পরিব্রাজক দলের মাহবুব মোস্তফা রাসেল, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের পারভেজ লেনিন, বিপ্লবী ছাত্র সংঘের আশিষ শর্মা, জাতীয় ছাত্র দলের সভাপতি আজিজুল ইসলাম ও ল্যাম্পপোস্টের সংগঠক প্রিন্স মাহমুদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ২য় পাতায় দেখুন

১ম বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা ॥ ১ ফেব্রুয়ারী ২০১০ ॥ জাতীয় বার্তা

জনসংহতি সমিতি কর্তৃক পার্বত্য চুক্তির এক যুগ পূর্তি পালিত

খাগড়াছড়িতে জনসংহতি সমিতির রূপায়ন গ্রুপ এক যুগ পূর্তিতে গত ২ ডিসেম্বর এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছে।

তাতিন্দ্র লাল চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রূপায়ন দেওয়ান, সুধাসিন্ধু খীসা, শক্তিমান চাকমা প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ সন্তু লারমার কড়া সমালোচনা করে তাকে আঞ্চলিক পরিষদ থকে পদত্যাগের পরামর্শ দেন। তারা বলেন, সন্তু লারমা দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও বিভিন্ন কেলেঙ্কারিতে জড়িত। তিনি প্রয়াত নেতা এম. এন লারমার আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে জেএসএস-কে তার পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিণত করেছেন। তার দ্বারা আর জনগণের আন্দোলন এগিয়ে নেয়া সম্ভব নয়।

তারা জেএসএস-কে সন্তু লারমার খপ্পর থেকে উদ্ধার করার জন্য জেএসএস-এর সাধারণ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

তারা গত ১২ বছরেও চুক্তি বাস্তবায়ন না করার জন্য সরকারের কড়া সমালোচনা করেন এবং অবিলম্বে চুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়নের দাবি জানান।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ১৮তম

১ম পাতার পর

শেষে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। এতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের শত শত কর্মি ও সমর্থক ব্যানার ও প্ল্যাকার্ডসহ অংশ নেন।

ঐদিন বিকেল থেকে কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিদায়ী সভাপতি রিকো চাকমা। সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক অংগ্য মারমা।

কাউন্সিলে অধিবেশন ২৭ জানুয়ারী পর্যন্ত চলে। এতে পিসিপির বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধিবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

কাউন্সিলে প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকসহ মোট ২৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

জেএসএস সন্তু গ্রুপ কর্তৃক ৭ ইউপিডিএফ কর্মি অপহৃত, পরে মুক্তি

জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের সদস্যরা রাঙ্গামটির মানিকছড়ির সাপছড়ি থেকে ৭ ইউপিডিএফ কর্মিকে অপহরণ করে। গত ২৫ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর পোস্টার লাগাতে গেলে এই ঘটনা ঘটে।

সন্তু গ্রুপের সদস্যরা কয়েকটি মোটর সাইকেলে এসে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাদের রাঙ্গাপান্যার দিকে নিয়ে যায়। অপহরণকারীরা ইউপিডিএফ সদস্যদের ভাড়া করা সিএনজি ড্রাইভার অনিল চাকমাকে মারধর করে। অবশ্য অন্যান্য সিএনজি ড্রাইভারদের প্রবল চাপের মুখে তারা সেদিনই তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

বাকিরা প্রতি জন ২৫ হাজার টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছাড়া পায়। তাদের অভিভাবকরা গত ৩১ ডিসেম্বর তাদেরকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে।

অপহৃত ইউপিডিএফ কর্মিরা হলেন প্রতুল চাকমা, সন্তোষ চাকমা, জিতেন চাকমা, খেরো চাকমা বিকাশ চাকমা, মিশন চাকমা ও বিন্দু ধন চাকমা। মিশন চাকমা ছাড়া বাকিরা সবাই খিলাছড়ি ও কুদুকছড়ি হাই স্কুলের ছাত্র।

অপহরণ ঘটনার আগের দিন মানিকছড়ির ঐ এলাকায় ইউপিডিএফ এর লাগানো পোস্টার সেনা সদস্যরা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। লাগানো পোস্টারে ভূমি অধিকার, জাতিসত্তার স্বীকৃতি দাবি তোলা হয়েছিল। জেএসএস বা কারো বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেনারা কেন ঐ পোস্টার ছিঁড়ে দেয় ও সন্তু গ্রুপ অপহরণের মাধ্যমে পোস্টার লাগাতে বাধা দেয় তা এলাকার সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়।

লক্ষীছড়িতে সেনা সৃষ্ট বোরখা

১ম পাতার পর

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সদস্য সত্য চাকমা (অনুপম) বয়স: ২২ পিতা-কিনা মোহন চাকমা। তার বাড়ি বামে মরাচেঙ্গী। প্রতিবাদের মুখে তাদের তিন জনকেই বোরখারা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

গত ২৯ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় বিজু চাকমা ও ফরাচান চাকমার নেতৃত্বে বোরখা পার্টির ৫ - ৬ জন সন্ত্রাসী বেলতলি পাড়ায় গিয়ে ফুলচান চাকমার ছেলে বিন্দু চাকমা (৪২) কে ধরে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা তাকে বেদম মারধর করার পর ছেড়ে দেয়। অবশ্য তার আগে তারা তার মোবাইল সেটটি কেড়ে রাখে।

গতকাল ২১ ডিসেম্বর ২০০৯ রাত আনুমানিক ১০টার সময় সেনা-সৃষ্ট সন্ত্রাসীরা লক্ষীছড়ি সদর ইউনিয়নের বক্যাছড়া গ্রামে হানা দেয়। তারা বাবুল্যা চাকমা (৩০) পিতা- রবি কুমার চাকমাকে বাড়ি থেকে বের করে তার কাছ থেকে এক লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। বাবুল্যা চাকমা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে সন্ত্রাসীরা তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। বাবুল্যা চাকমা জন্মগতভাবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। তিনি একটা চোখে দেখতে পান না। সন্ত্রাসীরা একই গ্রাম থেকে আরো তিনজনকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তারা হলেন, জয়ধন চাকমা (২৫) পিতা ধনঞ্জ চাকমা (কার্বারী), বিন্দুক্যা চাকমা (১৬) পিতা পালক্যা চাকমা, ও অনিল চাকমা (২৫) পিতা-খিলুকধন চাকমা। সন্ত্রাসীদের নেতৃত্ব দেয় কপিল সেন চাকমা ও বিজু চাকমা। এ সময় তারা মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় ছিলো।

গত ১৯ ডিসেম্বর '০৯ শনিবার সকাল আনুমানিক ৯.০০টার নির্মল কান্তি চাকমার নেতৃত্বে কয়েকজন সন্ত্রাসী হাতিছড়ার কালিমন্দির এলাকায় প্রকাশ্যে গাড়ি আটকিয়ে লক্ষীছড়ির মরাচেঙ্গী এলাকা থেকে মানিকছড়ি বাজারগামী লোকজনকে তাদের মালামালসহ নামায় এবং তাদেরকে মানিকছড়ি বাজারের পরিবর্তে লক্ষীছড়ি বাজারে মালামাল বিক্রি করতে চাপ দিতে থাকে। এ সময় লোকজন সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ করতে চাইলে সন্ত্রাসীরা জোন কমান্ডারকে ফোন করে। জোন কমান্ডার শরীফুল ইসলাম তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সন্ত্রাসীদের রক্ষা করে। এরপর সন্ত্রাসীরা জোন কমান্ডারের উপস্থিতিতে সাধারণ লোকজনকে মারধর করে। তাদের মারধরের শিকার একজন হলেন গবমারা গ্রামের বৃদ্ধ মনি চাকমা (৪৬) পিতার নাম স্মৃতি মোহন চাকমা।

এরপর ২০ ডিসেম্বর '০৯ রবিবার লক্ষীছড়ি জোনের একদল আর্মি মরাচেঙ্গী যতীন্দ্র কার্বারী পাড়ায় হানা দেয়। এ সময় আর্মিদের সাথে ছিল কপিল সেন চাকমা, বিষু চাকমা, ফরাচান চাকমা ও আলুবো চাকমা নামে চারজন বোরখা বাহিনীর সন্ত্রাসী। তারা মোটর সাইকেলে করে আর্মিদের পিছু পিছু যায়। সন্ত্রাসীরা সেখানে সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে গ্রামবাসীকে ভয় ভীতি দেখায় এবং তাদের দোকান বন্ধ রাখতে নির্দেশ জারী করে। একই দিন কয়েকজন বোরখা সন্ত্রাসী দুল্যাতলী ইউনিয়নের মাষ্টার পাড়ার দিকে গিয়ে একইভাবে জনগণকে হুমকি ও ভয়ভীতি দেখায় এবং লক্ষীছড়ি বাজারে আসার জন্য চাপ দেয়।

এসব বোরখা সন্ত্রাসীরা বর্তমানে লক্ষীছড়ি সেনা জোনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রকাশ্যে চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। তারা লক্ষীছড়ি থানার বাইন্যাছোলা ও মানিকছড়ি থানার তেলাছোলা এলাকায় নিয়মিত চাঁদা আদায় করছে। এই চাঁদা তারা জোন কমান্ডার শরীফুল ইসলামের সাথে ভাগ বাটোয়ারা করে থাকে বলে জানা গেছে।

ইতিপূর্বে ২৬ নভেম্বর সন্ত্রাসীরা সাবেক লক্ষীছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান দশরথ চাকমার বাড়িতে হানা দিয়ে তাকে শারীরিকভাবে মারধর করে। এ সময় তারা আরো কয়েকটি বাড়িতে তল্লাশী চালায় ও লোকজনকে বিভিন্ন হুমকি ধামকি দেয়।

সম্প্রতি "বোরখা পার্টি প্রতিরোধ কমিটি" নামে জনগণের একটি সংগঠন তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণায় সাড়া দিয়ে ইতিমধ্যে অনেকে নিজ সমাজের মধ্যে ফিরে এসেছে।

সাজেক সংবাদ

১ম পাতার পর

গ্রামবাসীকে সারা রাত তাদের সাথে রেখে পরদিন ভোরে ছেড়ে দেয়।

একইদিন মেজর আমিন ও লেঃ মাসুদের নেতৃত্বে অন্য একটি সেনা দল পূর্বপাড় বালুঘাটে হানা দেয়। সেখানে সেনারা ইউএনডিপি'র গঠিত সমিতির অফিস তৈরিতে বাধা দেয় এবং অরুণ বিকাশ চাকমা (৩৫) পিতা-শান্তি কুমার চাকমা নামে এক ব্যক্তিকে মারধর করে।

সেনারা একই তারিখে ভানে বাইবা ছড়া গ্রামেও যায়। সেখানে তারা নরম্যা চাকমার ছেলে বীরলাল চাকমার (৪৫) বাড়িতে তল্লাশি চালায় এবং ইউপিডিএফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সেনারা তাকে হুমকি দিয়ে বলে যে, কোন ভূমিহীন পাহাড়ি এলাকায় বসতি করতে পারবে না। যদি বসতি স্থাপন করে তাহলে গুলি করা হবে বলে তারা শাসায়।

গত ২৩ ডিসেম্বর আবারও সেনারা পূর্বপাড় বালুঘাটে হানা দেয় এবং ইউএনডিপি কর্তৃক গঠিত সমিতির সাইনবোর্ড জোরপূর্বক কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করে। এসময় সেখানে অবস্থানরত নারীরা প্রতিরোধ সৃষ্টি করে সেনাদের কাছ থেকে সাইনবোর্ডটি কেড়ে নেয়। এরপর সেনারা মনোরঞ্জন চাকমা নামে একজনকে ধরে নিয়ে আসতে চাইলে নারীরা আবারো প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলে মনোরঞ্জন চাকমাকে ধরে নেয়ার সেনাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

নিজ জমিতে কাজ করতে গেলে সেটলারদের বাধা

৯ ডিসেম্বর '০৯ সকাল আনুমানিক ৯টার দিকে লাম্লো চাকমার স্ত্রী হাসিনা চাকমা ও বলি চাকমা গঙ্গারামদোরে নিজ জমিতে কাজ করতে গেলে বহিরাগত সেটলাররা তাদের বাধা দেয়। এক পর্যায়ে মোঃ আবদুল, মফিজ ও রুবেল দা দিয়ে হাসিনা চাকমা ও বলি চাকমাকে ধাওয়া করে।

এর আগে গত ১১ নভেম্বর '০৯ আরতী চাকমা গঙ্গারামদোরে নিজ জায়গা পরিষ্কার করতে গেলে সেটলার মফিজ তাকে বাধা দেয়। আরতী চাকমা এখন নিজ জমিতে চাষাবাদ করতে পারছে না।

গত ১৩ নভেম্বর '০৯ সকাল আনুমানিক ৮.০০টা সময় বাঘাইহাট সেনা জোন থেকে একদল সেনা বালুঘাট গ্রামে যায়। সেখান থেকে সেনারা পাথরমনি চাকমা (৭২) পিতা মৃত নরম্যা চাকমাকে ধরে নিয়ে যায়। তাকে সকাল ৮.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত ক্যাম্পে আটকিয়ে রাখা হয়। এ সময় তাকে শারীরিকভাবেও নির্যাতন করা হয়। তাকে ছেড়ে দেয়ার আগে একটা সাদা কাগজে তার স্বাক্ষর নেয় হয়।

উল্লেখ্য, পাথরমনি চাকমার এক ছেলে রূপন চাকমা ইউপিডিএফ-এর সদস্য হিসেবে কাজ করছে। এই অপরাধে তাকে নির্যাতন ও হয়রানি করা হয়েছে বলে গ্রামবাসীরা ধারণা করছেন।

অরণ্য কুটিরে ভাঙচুর

গত ১০ নভেম্বর '০৯ মাজলং আর্মি ক্যাম্প থেকে সুবেদার সেলিম ও হাবিলদার ইকবাল (৪৪ বেঙ্গল)-এর নেতৃত্বে একদল সেনা মাজলং-এর পার্শ্ববর্তী পরিহলা চুগ অরণ্য কুটিরে যায়। সেখানে সেনারা কুটিরে ঢুকে জিনিষপত্র ভাংচুর করে।

এরপর আবার ১৯ নভেম্বর '০৯ সকাল আনুমানিক ১০টার সময় মাজলঙ আর্মি ক্যাম্পের ওয়ারেন্ট অফিসার সেলিম-এর নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একদল সেনা পুরীহলা চুগ বৌদ্ধ কুটিরে গিয়ে ভান্তের অনুপস্থিতিতে তার ছাবেক (ভিক্ষাপাত্র), প্লেট ও অন্যান্য বিভিন্ন জিনিষপত্র ভাঙচুর করে। এ সময় সেনারা ভান্তের পানীয়'র জন্য রাখা 7upও খেয়ে সাবাড় করে দেয়। ভান্তের নাম চিরসুখ ও সেবকের নাম শান্তি চাকমা।

গত ১ ডিসেম্বর জনসংহতি সমিতির সন্তু লারমা গ্রুপের সশস্ত্র সদস্যরা রুই লুই এর মিট পয়েন্ট এরিয়া থেকে তিন ব্যক্তিকে অপহরণ করে। এরা হলেন জ্যোতির্ময় চাকমা (৪৫), সাধন চন্দ্র চাকমা (৪৪) ও দীপ্তিমান চাকমা (৫০)। সন্ত্রাসীরা তাদের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। পরদিন গ্রামবাসীরা ২০ হাজার টাকা তুলে সেগুলো তাদের হাতে দিয়ে ঐ তিন জনকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে।

জুরাছড়িতে সন্তু গ্রুপের হামলায় ২ ব্যক্তি আহত

গত ৩১ ডিসেম্বর ভোর রাতে সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সদস্যরা জুরাছড়ি সদরের লেবার পাড়ায় হানা দেয়। তারা এ সময় গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সদস্য প্রশান্ত চাকমাকে (৩৬) গুলি করে ও দিন মজুর হিচ্ছোন্যা চাকমা (৩৫) পিতা কৃষ্ণ রতন চাকমাকে ছুরি ও লাঠি দিয়ে আঘাত করে আহত করে।

সোহেল চাকমা (২৮) ও জিতেশ চাকমার (২৬) নেতৃত্বে সন্তু গ্রুপের ১৬ জনের একটি দল এ হামলা চালায়।

প্রশান্ত চাকমার বাম হাতে গুলি লাগে। তাদের উভয়কে জুরাছড়ি সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

ইউপিডিএফ রাঙ্গামাটি জেলার সংগঠক শান্তি দেব চাকমা এ হামলার নিন্দা জানিয়েছেন।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ৭ম

শেষ পাতার পর

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে এক বিশাল র‍্যালি বের হয়। বিভিন্ন দাবি দাওয়া সম্বলিত প্ল্যাকার্ড, ইউপিডিএফ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের শত শত পতাকাসহ র‍্যালিটি জামাল খানস্থ চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে শেষ হয়।

বিকেলে "পার্বত্য চট্টগ্রামে নিপীড়ন বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামে নারী সমাজের ভূমিকা" শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সোনালী চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কমিটির চট্টগ্রাম শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যক্ষ মোহাম্মদ হোসেন খান, অধ্যাপিকা ফেরদৌস আরা আলীম, বাংলাদেশ লেখক শিবির চট্টগ্রাম শাখার সদস্য অরূপ বড়ুয়া, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাদাফ নূর-এ ইসলাম ও ইউপিডিএফ রাঙ্গামাটি জেলার সংগঠক শান্তিদেব চাকমা।

ইউপিডিএফ-এর ১১তম

১ম পাতার পর

স্বনির্ভরস্থ পার্টি কার্যালয়ে দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এছাড়া সকাল ১১:৩০টায় সাইকেল র‍্যালী, চন্দনপতি কনফারেন্স হলে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়, বিকাল ৩.০০টায় বয়োজ্যেষ্ঠ মুরুব্বী, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সম্মানে চা চক্র ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সাইকেল র‍্যালীটি স্বনির্ভর থেকে শুরু হয়ে খাগড়াছড়ি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

খাগড়াছড়ি ছাড়াও পানছড়ি, দিঘীনালা, মহালছড়ি, মাটিরাঙ্গা, গুইমারা, লক্ষীছড়ি, জুরাছড়ি, নান্যাচর, লংগুদু, মারিশ্যা, সাজেক, রাজস্থলী ও বান্দরবানসহ বিভিন্ন স্থানে পার্টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে বলে ইউপিডিএফ জানিয়েছে। তবে কুদুকছড়িতে সাত ইউপিডিএফ কর্মি ও সমর্থক জেএসএস-এর সন্তু গ্রুপ কর্তৃক অপহৃত হওয়ায় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচী প্রতিবাদ সমাবেশে রূপ নেয়।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এ উপলক্ষে প্রচারিত একটি লিফলেটে বলা হয়েছে, "অনেক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আশ্বস্ত হবার মত পদক্ষেপ সরকার নেয়নি। সেনা প্রত্যাহার, ভূমি জরিপ -- এসব হচ্ছে সরকারের রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজি। জাতিসত্তার স্বীকৃতি বিষয়টি ফয়সালা না করে সরকার '৭২-এর সংবিধান প্রবর্তনের আওয়াজ তুলছে। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, '৭২-এর সংবিধানে সবাইকে 'বাঙালি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল, যা তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মেনে নেয়নি এবং এখনও মানে না। কোন রাজনীতি সচেতন নাগরিকের নিকট তা গ্রহণযোগ্য নয়।

দক্ষিণ কোরিয়া

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহারের দাবিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ, স্মারকলিপি পেশ

॥ আন্তর্জাতিক ডেস্ক ॥

দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবাসী পাহাড়িদের সংগঠন জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক - কোরিয়া সিউলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর সকাল দশটায় অনুষ্ঠিত এই বিক্ষোভে সংহতি বক্তব্য রাখেন বুড্ডিস্ট সংগঠনের প্রতিনিধি Son Sang Hoon ও কোরিয়া সোস্যালিস্ট পার্টির সভাপতি Choi Kwang Eun. এছাড়া বক্তব্য রাখেন জেপিএনকে'র সদস্য বোধিপ্রিয় চাকমা, সুইটলি চাকমা, জিকো চাকমা ও প্রজ্ঞাদ্বীপ চাকমা। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সম্পূর্ণ সেনা প্রত্যাহার ও ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভের আগে পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি আইনের স্বীকৃতি দিতে হবে।

বিক্ষোভ চলার সময় বাংলাদেশ এ্যামবেসির এক কর্মকর্তা হঠাৎ বিক্ষোভ স্থলে হাজির হয়ে আবার চলে যান। সোসালিস্ট পার্টির নেতা চোই বাংলাদেশ এ্যাম্বেসি কর্মকর্তার এই আচরণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, তার এই আচরণ প্রমাণ করে যে বাংলাদেশ সরকার পাহাড়িদের অধিকারের প্রতি মোটেই মনোযোগ দেয় না। তিনি বলেন বাংলাদেশ সরকারের উচিত পাহাড়িদের অধিকার ও দাবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

বুড্ডিস্ট সোসাল এন্ড হিউম্যান রাইটস অরগানাইজেশন এর প্রতিনিধি সন স্যাং হুন জেপিএনকে আয়োজিত বিক্ষোভকে (প্রেস কনফারেন্স) গুরুত্বপূর্ণ অভিহিত করে বলেন বাংলাদেশে সরকারের উচিত এই বিক্ষোভের লক্ষ্যের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেয়া।

বিক্ষোভ শেষে বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবর একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এতে স্বাক্ষর করেন জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক -কোরিয়া (জেপিএনকে), কোরিয়ান হাউজ ফর ইন্টারন্যাশন্যাল সলিডারিটি (KHIS), বুড্ডিস্ট সলিডারিটি ফর রিফরম (BSR), পিপল্‌স সলিডারিটি অব ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস, পিপল্‌স এ্যালায়েন্স ফর মুভমেন্ট, কান্ট্রিওয়াইড লেবার সোসাইটি, সোসাইটি অব দ্যা একটিভিস্ট, রিফিউজি পিনান এবং ইমাজিনেশন ফর ইন্টারন্যাশন্যাল সলিডারিটি (IFIS)।

স্মারকলিপিটি পড়ে শোনান পিনানের এক সদস্য কিম জে ওয়ান। বিক্ষোভ সমাবেশটি পরিচালনা করেন জেপিএনকে'র প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ধীমান ত্রিপুরা।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, ১৯৯৬ - ২০০১ সালে ক্ষমতায় থাকার সময় আওয়ামী লীগ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এই চুক্তি স্বাক্ষরের প্রায় ১২ বছর পরও পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতির

সিউলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে জেপিএনকে'র বিক্ষোভ

উন্নতি হয়নি এবং চুক্তিটি একটি কাগুজে চুক্তিতে পরিণত হয়েছে, কারণ সরকার এই চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে কখনো আন্তরিকতা দেখায়নি। স্মারকলিপিতে এক ব্রিগেড সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলা হয়েছে, "অপারেশন উত্তরণ" বন্ধের ঘোষণা দিতে সরকারের ব্যর্থতায় আমরা আশাহত হয়েছি।" কতিপয় দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে এতে বলা হয় আংশিক সেনা প্রত্যাহারের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি বলেই চলে।

স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরকারী সংগঠনগুলোর মতে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না। কারণ এই অঞ্চলের ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা সমতলের চাইতে ভিন্ন। "যদি পাহাড়ি জনগণের প্রথাগত ভূমি আইনের স্বীকৃতি দেয়ার আগে ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে করা হয়, তাহলে বহু পাহাড়ি তাদের জমি হারাবেন, কারণ তারা তাদের জমির মালিকানা দাবির সমর্থনে কাগজপত্র দেখাতে সমর্থ হবেন না। অপরদিকে, সেটলারদের রয়েছে সরকার প্রদত্ত জমির ভূয়া দলিলপত্র।"

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি, গণতন্ত্র ও উন্নয়নের স্বার্থে স্মারকলিপিতে তিনটি দাবি জানানো হয়। এক. অপারেশন উত্তরণের নামে বলবৎ করা সামরিক আইন তুলে নেয়া ও বেসামরিকীকরণ শুরু করা; দুই. পাহাড়ি জনগণের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করা, মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া; এবং তিন. ভূমি বেদখল বন্ধ করা ও ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে পরিচালনার পূর্বে পাহাড়ি জনগণের প্রথাগত ভূমি আইনের স্বীকৃতি দেয়া।

সিউলে পাচগ্রা'র মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর রিপোর্ট প্রকাশ, আলোচনা সভা, ভিডিও ও ছবি প্রদর্শনী

॥ আন্তর্জাতিক ডেস্ক ॥

গত ১৬ ডিসেম্বর জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক - কোরিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর রিপোর্ট প্রকাশ উপলক্ষে সিউলস্থ ন্যাশন্যাল হিউম্যান রাইটস কমিশনের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা, স্থির চিত্রের স্লাইড শো ও ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করে।

জেপিএনকে'র সমন্বয়ক রনেল চাকমা ননি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। মাল্টি কালচারাল ফ্যামিলি এসোসিয়েশনের সভানেত্রী জং হি সিল-এর সঞ্চালনায় সভায় সংহতি বক্তব্য রাখেন সোস্যাল এনভায়রনমেন্ট রিসার্চ সেন্টার এর প্রতিনিধি ড. কু ডু ওয়ান এবং হানিয়াং ইউনিভার্সিটির মাল্টি কালচারাল রিচার্স সেন্টার-এর প্রতিনিধি ড. ওহ গিয়ুং সোক। এছাড়া গত বছর ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বক্তব্য উপস্থাপন করেন দুই কোরিয়ান -- ওন গিয়ুন চোই ও জং চুলি কিম।

উদ্বোধনী ভাষণে রনেল চাকমা ননি বলেন, ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জনগণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ১৯৭১ সালের এদিন বাংলাদেশ

কোরিয়ার টিভি চ্যানেলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর ডক্যুমেন্টারি প্রদর্শিত

॥ সিউল প্রতিনিধি ॥

গত আক্টোবর মাসের ৯ তারিখ কোরিয়ার বিশিষ্ট টেলিভিশন চ্যানেল- MBC (মুনহোয়া বাংসং) এর World wide weekly প্রোগ্রামে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকাররের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এক প্রামাণ্য চিত্র প্রচারিত হয়। উক্ত প্রামাণ্য চিত্রে পার্বত্যচুক্তি, ভূমি বে-দখল, পূর্ণস্বায়ত্বশাসন আন্দোলনপন্থী পাহাড়ীদের উপর রাজনৈতিক হয়রানী, প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাহাড়ীদের উপর সেনাবাহিনীর অত্যাচার ও বৈষম্যমূলক আচরণের উপর আলোকপাত করা হয়। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে সাংবাদিক, আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মীর একটি দল নিজস্ব উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করে উক্ত প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করে। তদন্ত দলটি গত ১৬ই ডিসেম্বর কোরিয়ায় প্রবাসী পাহাড়িদের সংগঠন "জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-কোরিয়া"-এর পৃষ্টপোষকতায় একটি দীর্ঘ তদন্ত প্রতিবেদনও প্রকাশ করে। দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

কোরিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর রিপোর্ট প্রকাশ এটা প্রথম নয়। ২০০৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের প্রতিবেদন "জীবন আমাদের নয়" কোরিয়া ভাষায় অনুদিত হয় এবং একই বছর পি.এন.এ.এন নামের সিউল-ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর শেষে ঐ এলাকার মানবাধিকারের উপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং ২০০৭ সালে দিল্লী ভিত্তিক "এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস" কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন Then and now কোরিয়া ভাষায় ভাষান্তর ও প্রকাশিত হয়। তাছাড়া কোরিয়ার অনলাইন ও অফলাইন সংবাদ মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার নিয়মিত স্থান পায়।

জেপিএনকে'র রিপোর্ট প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপবিষ্ট জং হি সিল, ওন গিয়ুন চোই এবং জং চুলি কিম।

স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সামাজিক বৈষম্য, অস্থিতিশীলতা, আইনের শাসন ও সুশাসনের অনুপস্থিতির কারণে সাধারণ জনগণ প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ থেকে আজও বঞ্চিত। তিনি রিপোর্ট প্রকাশকে বাংলাদেশের পাহাড়ি জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেন।

কোরিয়ান ভাষায় লেখা ৪৮-পৃষ্টার এই রিপোর্টে সেটলার কর্তৃক ভূমি বেদখল ও নারী নির্যাতনসহ সেনাবাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

১ম বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা ॥ ১ ফেব্রুয়ারী ২০১০ ॥ জাতীয় বার্তা

সম্পাদকীয়

১ম বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা ॥ ১ ফেব্রুয়ারী ২০১০

সরকার বদলেছে, অপরিবর্তিত নীতি-কৌশল, জনগণের লড়াই অব্যাহত

'বার মাসে তের পার্বণের দেশে' সরকারের রদবদলও যেন গ্রাম বাংলায় আয়োজিত মেলা-উৎসবের নাগরদোলার পরিক্রমণ ভিন্ন কিছু নয়। কখনও 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী শক্তি' কখনও 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার' আবার কখনও 'বাঙালি জাতীয়তার ধ্বজাধারী স্বাধীনতা সপক্ষের মহাজোট' নানান ফাঁকা বুলি আওড়িয়ে, লোক ঠকানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে চক্রাকারে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। নাগরদোলা যেমন একটি চক্রের মধ্যে ঘূর্ণায়মান গতিতে আবর্তিত হয়, সামনে এগোয় না কখনও। বাহারি নামের রাজনৈতিক জোট-দলগুলোও পালাক্রমে সরকার গঠন করে লুটপাট-দুর্নীতির বৃত্তের মধ্যেই ঘুরপাক খায়, নিজেরা আখের গুছিয়ে আঙুল ফুলে কলাগাছ বনে যায়। দেশ ও জনগণের ইতর বিশেষ অগ্রগতি ঘটে না। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর মহাসমারোহে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার বদল হবার পরও অবস্থার তেমন কোন তারতম্য চোখে পড়ে না। এ হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণের নির্মম ট্র্যাজেডি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় কথাটি আরও বেশি সত্য। এটি দেশের প্রান্তিক অঞ্চল, সব ক্ষেত্রেই অবহেলিত, উপেক্ষিত। নানাভাবেই এখানকার জনগণ সবচে' বেশি নিগৃহীত শোষিত ও বঞ্চিত। নির্দিষ্ট সময় অন্তর সরকার বদল এ অঞ্চলে মৌলিক কোন পরিবর্তন আনে না। এতে শুধু দলের বদল হয় মাত্র, সরকারের নীল নক্সা থাকে অপরিবর্তিত। 'যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ', প্রতি বারই সরকার বদলের সাথে এ নির্মম সত্যের মুখোমুখি হয় পাহাড়ি জনগণ। দেখা যায়, যে দলই ক্ষমতায় আসুক, 'বাংলাদেশী' বা 'বাঙালি'-- যে 'জাতীয়তার' নামাবলীই তারা গায়ে দিক, 'দিন বদলের' যত চটকদার শ্লোগান-যত গালভরা প্রতিশ্রুতিই তারা দিয়ে থাকুক, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যত হাঁকডাক তারা ছাড়ুক, প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের পরীক্ষা হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে। এখানে তাদের জাতীয়তাবাদ রূপ নেয় সাম্প্রদায়িকতায়। গণতন্ত্র পিষ্ট হয় বুটের তলায়, 'অপারেশন উত্তরণ' জারি থাকে, সেনা খবরদারির হেরফের হয় না মোটেও। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় ভূমি অগ্রাসন ও উচ্ছেদ অভিযান। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পরিণত হয় ফাঁকা বুলিতে। সরকার-প্রশাসন পর্যবসিত হয় প্রহসনে। আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পার্বত্য অঞ্চলের নীতি নির্ধারণে পার্লামেন্ট বা মন্ত্রীসভার বৈঠক নয়, সেনা জোন, রিজিয়ন (ব্রিগেড) ও ২৪ পদাতিক ডিভিশনই হল আসল কেন্দ্র।

পার্বত্যবাসীদের তিক্ত অভিজ্ঞতা এই, সরকার বদলের সাথে সাথে সমাজের সুযোগ সন্ধানী, ধান্দাবাজ, দুর্বৃত্ত ও অপরাধপ্রবণ লোকের আখড়ায় পরিণত হয় ক্ষমতাসীন দল। সমাজে বেড়ে যায় দালাল প্রতিক্রিয়াশীলদের দৌরাত্ম্য। তাদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারেন না জনপ্রতিনিধিরাও। জনগণের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির মতলবে গণদুশমনরা সরকার কর্তৃক নানাভাবে পুরস্কৃত ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত হয়। নির্বাচন ছাড়াই মনোনয়ন লাভ করে বড় বড় প্রতিষ্ঠানে। খুদ-কুড়োর মত ছিটিয়ে দেয় লাইসেন্স-পারমিট, অবাধে চলতে দেয় টেন্ডারবাজি। ক্ষমতাসীনদের আশীর্বাদপুষ্ট ধান্দাবাজদের দৌরাত্ম্যে প্রকৃত ব্যবসায়ী-ঠিকাদাররা টিকতে পারেন না। দলীয় আশীর্বাদপুষ্ট নাম গোত্রহীন ভুঁইফোঁড়রা রাতারাতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, অর্থ বিত্তের অধিকারী হয়। এতে আকৃষ্ট হয় সমাজের অন্য ধান্দাবাজ আত্মমর্যাদাহীন দেউলিয়া লোকজন। রাতারাতি প্রতিষ্ঠালোভী এ শ্রেণীর লোকদের নাকের ডগায় মূলা ঝুলিয়ে সরকারি দলে ভাগিয়ে নিয়ে জনগণকে বিভক্ত ও আন্দোলন দুর্বল করাই হচ্ছে এর আসল উদ্দেশ্য। 'পার্বত্য চুক্তির' মাধ্যমে আওয়ামী সরকার '৯৭ সালেই একটি অংশকে বশীভূত করে রাজনৈতিকভাবে আন্দোলন থেকে সরিয়ে নিয়ে নিজ পক্ষে টেনে নিতে সক্ষম হয়।

পার্বত্য চুক্তিত্তোর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নতুন মাত্রা লাভ করেছে। একদিকে সরকার জনগণের লড়াই সংগ্রাম দমন করতে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। অর্থ-বিত্ত-ক্ষমতা নানান সুযোগ সুবিধার প্রলোভন দিচ্ছে। জনগণের মাঝে হতাশা ছড়াতে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অন্যদিকে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন সময়ে আরও ব্যাপকভাবে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। এ সময়ের আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি ও জনগণের জীবন যাত্রা বস্তুনিষ্টভাবে তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে একটি প্রকাশনা। দেশে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ক'টি পত্রিকা চালু আছে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সবাই কমবেশি অবহিত।

সময়ের দাবিতে জনগণের মুখপত্র হিসেবে অনিয়মিত বুলেটিন জাতীয় বার্তার আত্মপ্রকাশ ঘটল। নির্যাতিত, অবহেলিত ও পশ্চাদপদ মানুষের পক্ষে জাতীয় বার্তা কথা বলবে।

লক্ষ্মিছড়িতে নীরব বিদ্রোহ

ন্যু চিং মারমা

গত প্রায় তিন মাস ধরে লক্ষ্মিছড়ি এলাকার জনসাধারণ লক্ষ্মিছড়ির বাজার বয়কট করছেন। ৯ অক্টোবর পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কর্মি সমর্থকদের ওপর হামলার পরদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বয়কটের ডাক দেয়া হয়। এলাকার জনগণের দাবি উক্ত হামলার আসল হোতা লক্ষ্মিছড়ি জোন কমান্ডার লেঃ কর্নেল শরীফুল ইসলাম ও থানার এসআই ফরিদকে শাস্তি দিতে হবে। এই দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বয়কট চলবে।

জনগণের এই দাবি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। বাজার বয়কট কার্যকর কমিটির নামে বিলি করা একটি লিফলেটে বলা হয়েছে: "যে বাজারে গেলে মার খেতে হয়, মেয়েদের লাঞ্ছিত হতে হয়, অপমানিত হতে হয়, সে বাজার বয়কট করা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। যে অত্যাচারী, যে নির্যাতক ও যে জুলুমবাজ তাকে জনগণ বয়কট করবে এটাই স্বাভাবিক। জনগণের হাতে এটাই হলো অন্যতম মোক্ষম অস্ত্র যা তারা এই নির্যাতকদের বিরুদ্ধে ভালোভাবে প্রয়োগ করতে পারেন। কাজেই এই বাজার বয়কট অব্যাহত রাখতে হবে এবং এভাবেই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে হবে। ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করলেই কেবল অত্যাচারী শোষকরা মাথা নত করতে বাধ্য হয়।"

লক্ষ্মিছড়ি মরাচেঙে নতুন বাজার - ছবি জা.বা.

জনগণ লক্ষ্মিছড়ি বাজারে যাওয়া বন্ধ করলেও মরাচেঙে নামক স্থানে যে কয়টি দোকান আছে সেখানে গিয়ে কেনাকাটা করছেন। ফলে এখানে এখন জমজমাট বাজার বসেছে। কেনাকাটা বেচাবিক্রিও হচ্ছে প্রচুর। অনেকে আবার মানিকছড়ি বাজারেও যাচ্ছেন।

জনগণের এই নীরব বিদ্রোহের ফলে শরীফুল ইসলাম বেকায়দায় পড়েছেন। লক্ষ্মিছড়ির দোকানী ও ব্যবসায়ীরা সমস্ত দোষ এখন তার ওপর চাপাচ্ছেন। কারণ বাজার বয়কটের কারণে তাদের ব্যবসা লাটে ওঠার উপক্রম হয়েছে। সওদা বিক্রি না হলে তাদের উপোষে মরা ছাড়া আর কি উপায় আছে! তারা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন শরীফুল ইসলামের উস্কানিতে নিরীহ লোকজনের ওপর হামলা করে কি ভুলটাই না তারা করেছেন। তারা এটাও বুঝেছেন যে শরীফ লক্ষ্মিছড়িতে স্থায়ী বাসিন্দা নন। তিনি সেনাবাহিনীতে চাকুরীরত একজন সামান্য অফিসার মাত্র। যে কোন সময় তাকে বদলী হয়ে যেতে হবে। আজ আছেন কাল নেই। সেজন্য জনগণের সাথে সম্পর্ক ভালো খারাপের ধার তিনি ধারেন না। অথচ যারা হামলায় অংশ নিয়েছেন তাদের অবস্থা ভিন্ন। ভালো হোক খারাপ হোক পাহাড়িরা তাদের প্রতিবেশী এবং তাদেরকেই আজীবন পাহাড়িদের সাথে পাশাপাশি বসবাস করতে হবে। কিন্তু তার কথায় বিনা কারণে হামলা চালিয়ে তারা পাহাড়িদের ওপর চরম অন্যায় করেছেন, এবং এর ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অবিশ্বাস ও সন্দেহের দেয়াল সৃষ্টি হয়েছে তা ভাঙতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।

অথচ এত বড় অপরাধ করার পরও হামলাকারীরা আজ পর্যন্ত এই হামলার জন্য দুঃখ প্রকাশ কিংবা ক্ষমা প্রার্থনা কোনটাই করেনি। আওয়ামী লীগের নামধারী কিছু সন্ত্রাসীও এই হামলার সাথে জড়িত ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ মুখে তাদের কোন কর্মি জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করলেও কোন নেতা এই বর্বর হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ করেনি।

লক্ষ্মিছড়ির দোকানীরা বাজার চালুর জন্য ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনের ওপর বার বার চাপ দিচ্ছেন। খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসকও একবার লক্ষ্মিছড়ি এসে মিটিঙ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি। এটা এখানে উল্লেখ করা দরকার, এই জেলা প্রশাসক ৯ অক্টোবর পাহাড়িদের ওপর হামলা হওয়ার কথা সাংবাদিকদের কাছে বেমালুম অস্বীকার করেছিলেন। তার মতো মিথ্যাবাদী জেলা প্রশাসক সারা দেশে দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

কেউ বাজারে যেতে না চাইলে তাকে জোর করে বাজারে নিয়ে আসা যায় না। জোর করে নিয়ে আসলে চাইলে সেটা হবে অপরাধ। কারোর ইচ্ছে হলে বাজারে যাবে, না হলে যাবে না -- এটা তার মৌলিক অধিকার। কিন্তু শরীফ সাহেব এই অধিকারও হরণ করতে চান। তিনি বাহুবলে সব কিছু করতে চান। তিনি বয়কটের প্রথমদিকে কয়েকজনকে জোর করে তার গাড়িতে তুলে লক্ষ্মিছড়ি বাজারে নিয়ে আসেন। অপরদিকে, লক্ষ্মিছড়ি থানার ওসি মরাচেঙে বাজারের কয়েকজন ব্যবসায়ীর মালামাল অন্যায়ভাবে আটক করেন। অবশ্য অনেক বাদানুবাদের পর তিনি ঐ মাল ফেরত দিতে বাধ্য হন। লক্ষ্মিছড়ি বাজারের গুটিকয় ব্যবসায়ীও পাহাড়িদের মালামাল আটক করে। কিন্তু তাদেরকেও পরে মালগুলো ছেড়ে দিতে হয়। এভাবে একটা ভুল ধামাচাপা দেয়ার জন্য হামলাকারীরা এখন অনেক ভুল ও অপরাধের জন্ম দিচ্ছে। এতে সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে।

লক্ষ্মিছড়ি বাজারের ব্যবসায়ীদের উচিত ৯ অক্টোবর হামলার জন্য প্রকাশে দুঃখ প্রকাশ করা ও ক্ষমা চাওয়া, সংঘবদ্ধ হয়ে উগ্রসাম্প্রদায়িক ও জুলুমবাজ শরীফুল ইসলামের বিচার শাস্তি দাবি করা এবং বাজার বয়কটের কারণে তাদের যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করা। মূলত তার কারণেই লক্ষ্মিছড়িতে পাহাড়ি বাঙালি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়েছে। তার কারণেই ব্যবসায়ীদের লোকসান গুনতে হচ্ছে। তিনি যতদিন লক্ষ্মিছড়ি থাকবেন ততদিন শান্তি আসবে না।

আর জোর করে পাহাড়িদেরকে বাজারে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হবে চরম বোকামী। তাদেরকে বিনা অপরাধে মেরে হাত, পা ভেঙে ও মাথা ফাটিয়ে দেবেন, তার জন্য ক্ষমাও চাইবেন না: আবার প্রতিবাদও করতে দেবেন না, আর বাজার বয়কটের ফলে আর্থিকভাবে লোকসান হলে জোর করে তাদেরকে বাজারে নিয়ে এসে নিজেদের মাল তাদের কাছে বিক্রি করতে চাইবেন, সে দিন শেষ হয়ে গেছে। বন্দুকের জোরে অনেক কিছু করা যায়, কিন্তু সব কিছু করা যায় না এবং সব আন্দোলনও দমন করা যায় না। শরীফের মতো কুপমন্ডুকদের পক্ষে না হয় এ সত্য উপলব্ধি হয় না, কিন্তু সেনাবাহিনীর মধ্যে কিংবা আওয়ামী লীগ সরকারের মধ্যে কি বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের অভাব ঘটেছে?

শেষে এটা বলা দরকার, লক্ষ্মিছড়ির জনগণ বাজার বয়কটের মাধ্যমে ৯ অক্টোবরের হামলা তথা গণদুশমন লেঃ কঃ শরীফের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের যে অভিনব প্রতিবাদ জানাচ্ছেন তা অত্যন্ত কার্যকর ও ফলদায়ক। তাদের এই নীরব প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক, অথচ বিপ্লবী চরিত্রসম্পন্ন। নিজের আত্মমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এভাবে সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদ প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ করা ছাড়া অপমানিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, শোষিত ও নির্যাতিত জনগণের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই। যে কোন ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন ঠিকভাবে পরিচালিত হলে তা সফল হতে বাধ্য। অন্যায়কারীরা যতই হম্বিতম্বি করুক, তারা জানে ভিতরে ভিতরে তারা অত্যন্ত দুর্বল। ■

রুই খই মারমার স্মৃতি বেঁচে থাকবে

দুর্দম চাকমা

গত ২ অক্টোবর ২০০৯, শুক্রবার, ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) অন্যতম কেন্দ্রীয় সদস্য ও আন্দোলন-সংগ্রামের বহু অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ জননেতা রুই খই মারমা সেনা-সন্ত্র মদদপুষ্ট নব্য-মুখোশ বাহিনী তথাকথিত সিএইচটিএনএফ (চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস্ ন্যাশন্যাল ফ্রন্ট) সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র হামলায় নিহত হন।

ইউপিডিএফ নেতা শহীদ রুই খই মারমা

রুই খই মারমা -- যিনি অংসাইন নামে সর্বাধিক পরিচিত -- ১৯৫২ সালে রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালিতে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং জনসংহতি সমিতিতে যোগ দেন। ১৯৮৩ সালে জেএসএস দ্বিধাবিভক্ত হলে তিনি বাদি গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হন। জেএসএস-এর দুই উপদলের গৃহযুদ্ধে বাদি গ্রুপ পরাজিত হলে তিনি কিছু সময় সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে অবস্থান নেন। ১৯৯৮ সালে নতুন পার্টি ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) গঠিত হলে তিনি এই পার্টির সাথে যুক্ত হন এবং এই নতুন পার্টির বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তিনি আমৃত্যু তা আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে গেছেন।

রুই খই মারমা একজন আপাগোড়া সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের নাম। তিনি ভাগ্য বিড়ম্বিত, লাঞ্ছিত-বঞ্চিত ও অধিকারহারা জনগণের অধিকার ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। জনগণের ওপর সেনা নির্যাতন, ভূমি বেদখল ও সন্ত্র-সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে রয়েছে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান। সম্প্রতি লক্ষিছড়ি, মানিকছড়ি ও রামগড়ে সেনা-উস্কানিতে যে ভূমি বেদখলের মহোৎসব শুরু হয় তার বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করে সক্রিয় গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তার দক্ষ নেতৃত্বের কারণেই স্থানীয় সেনা বাহিনী ও তাদের চর-এজেন্টদের একের পর এক ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। তার কারণেই গণদুষমন বহিস্কৃত বেঈমানরা এলাকায় মাথা তুলতে পারেনি। তার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার জন্যেই ভূমি দস্যুরা সাময়িকভাবে হলেও পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। এক কথায় তিনি অপরিসীম দায়িত্বশীলতার সাথে এলাকায় জনগণের স্বার্থের পাহারা দিয়েছেন।

আর এ কারণেই বদমাশ গণশত্রুরা তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ প্রহরী জেগে থাকলে ও তার দায়িত্ব ঠিকমত পালন করলে, চোর ডাকাত দলের সেটা পছন্দ হওয়ার কথা নয়। কতিপয় সেনা কমান্ডার, জাতীয় বেঈমান, দালাল ও স্পাইদেরও তাই অংসাইন-এর মতো দেশপ্রেমিক ও জনদরদী ভূমিকা পছন্দ হয়নি। তাই তারা তাকে শেষ করে দেয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে "পবিত্র ঐক্য" গড়ে তোলে ও গোপনে একের পর এক ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকে। এই ষড়যন্ত্রের আসল হোতা হলো স্থানীয় এক সেনা কমান্ডার, যে এলাকার জনগণের কাছে নির্যাতক ও ত্রাস হিসেবে পরিচিত। সেনা পোষাক পরিহিত এই সন্ত্রাসীর হাতে আজ পর্যন্ত লক্ষিছড়িতে কত নিরীহ পাহাড়ি ও বাঙালি নির্যাতন, নিগ্রহ ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন তার হিসাব কষতে অনেক সময় লাগবে। তার বুটের তলায় আজও জনগণের মৌলিক ও রাজনৈতিক অধিকার পিষ্ট হয়ে আছে। জনগণের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ফ্যাসিস্ট কায়দায় বানচাল করে দিতে সে অভ্যস্ত। এ কারণে লোকজন রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে তাকে অভিসম্পাত দিয়ে থাকে।

এই সেনা কমান্ডারই জনগণের অকৃত্রিম বন্ধু অংসাইনসহ ইউপিডিএফ-এর অন্যান্য নেতাকর্মীদের নিশ্চিহ্ন করতে কতিপয় বহিস্কৃত, নৈতিকভাবে অধঃপতিত ও বখাটে ছেলেপিলে ভাড়া করে এবং তাদেরকে জড়ো করে সিএইচটিএনএফ নামে একটি সন্ত্রাসী বাহিনী গঠন করে, যা জনগণের কাছে নব্য মুখোশ বাহিনী বা বোরখা পার্টি নামে পরিচিত। সিএইচটিএনএফ সন্ত্রাসীদের জন্মদাতা এই কুখ্যাত সেনা কমান্ডার মানিকছড়ির একটি সেনা ক্যাম্পে গত জুলাই মাসে নব্য-মুখোশদের সাথে বেশ কয়েক বার গোপন বৈঠকে মিলিত হয় এবং খুন, অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়ের জন্য তাদেরকে উস্কানি দেয়। এই সব মিটিঙে উপস্থিত কয়েকজন বোরখা পার্টির সদস্য ইউপিডিএফ-এর কাছে তাদের ভুল স্বীকার করে এবং সমস্ত ষড়যন্ত্র ও তথ্য ফাঁস করে দেয়।

এটা আজ সবার কাছে স্পষ্ট, উপরোক্ত কুখ্যাত সেনা কমান্ডারই তার সৃষ্ট নব্য মুখোশ বাহিনী সিএইচটিএনএফ সন্ত্রাসীদের দিয়ে ইউপিডিএফ নেতা রুই খই মারমাকে খুন করিয়েছে। ঘটনার পর সে নিজেই বেফাঁসে তার অপরাধ স্বীকার করেছে। গত ৭ অক্টোবর লক্ষিছড়ির আইন শৃঙ্খলা মিটিঙে বক্তব্য দিতে গিয়ে উল্লসিত হয়ে ২ অক্টোবর রুই খই মারমার খুনের ঘটনাকে উল্লেখ করে সে বলেছে যে, এই ঘটনার মাধ্যমে সে ইউপিডিএফ-এর মূলে আঘাত করেছে। সে পর্যায়ক্রমে আরো আঘাত হানবে বলে উক্ত মিটিঙে জানায়। তার এই বক্তব্য মিথ্যে নয়। যার একবার খুনের নেশা পেয়ে বসেছে সে কেবলই খুন করতে চায়। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে রুই খই মারমা অংসাইনকে খুন করার পর সে তার পরবর্তী টার্গেট ঠিক করে ফেলেছে। ৫ অক্টোবর যেদিন দাহ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় সেদিনই উক্ত সেনা কমান্ডার তার ভাড়া করা জনা কয়েক সন্ত্রাসীকে দিয়ে লক্ষিছড়িতে ইউপিডিএফ নেতা রতন মারমা জয় ও উপজেলা চেয়ারম্যান রেম্রোচাই মারমার বিরুদ্ধে মিছিল করিয়েছে। উক্ত মিছিলের খবর সেদিন দিগন্ত টেলিভিশন চ্যানেলের নিউজ বারে দেখানো হয় এবং বলা হয় যে, ইউপিডিএফ-এর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে রেম্রোচাই মারমার বিরুদ্ধে মিছিল করা হয়েছে।

এটা খুবই স্পষ্ট যে, উক্ত সেনা কমান্ডার ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে উঠেপড়ে লেগেছে। গত উপজেলা নির্বাচনে সে রেম্রোচাই মারমার বিপক্ষে এক মহিলা প্রার্থীকে নির্বাচনে জিতিয়ে দেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালায়। কিন্তু ইউপিডিএফ রেম্রোচাই মারমাকে সমর্থন দেয়ায় তার পছন্দের প্রার্থী বিপুল ভোটে পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে সে তখন বলেছিল যে রেম্রোচাই মারমা "কিভাবে কাজ করে সে দেখবে।" এরপরই সে তার কল্পিত বিপক্ষীয় লোকদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য একের পর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে থাকে। রেম্রোচাই মারমার বিরুদ্ধে মিছিল কিসের ইঙ্গিত বহন করে সেটা বোঝার জন্য পণ্ডিত বা রকেট সায়েন্টিস্ট হওয়ার দরকার নেই। এই সেনা কমান্ডার যে কত প্রতিহিংসা পরায়ণ সেটা তার অন্য এক উক্তি থেকেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর সে কয়েকজন নিরীহ লোকজনকে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে কারেন্টের শক দিয়ে ও লাঠিপেটা করে অত্যাচার চালায়। এই নির্যাতিতরা পরে এমপি যতিন্দ্র লাল ত্রিপুরার কাছে তাদের ওপর নির্যাতনের বর্ণনা দিলে সে এজন্য তাদেরকে আরো ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে নানা ধরনের হুমকি দেয়। এক পর্যায়ে সে বলে: "প্রয়োজনে আমি লক্ষিছড়ি ছাড়বো; তবে লক্ষিছড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগে অন্য ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যাবো"

তার সৃষ্ট সিএইচটিএনফ গুন্ডারা লক্ষিছড়ি ছাড়া অন্যত্রও সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার ২৯ জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে এক ব্রিগেড সেনা সদস্য প্রত্যাহার করার ঘোষণা দিলে সেটা বানচাল করে দেয়ার জন্য সেনা গোয়েন্দারা সিএইচটিএনএফ সন্ত্রাসীদের মাঠে নামায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল প্রমাণ করার জন্য তারা বান্দরবানে বেশ কয়েকজন বাঙালি ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে। সিএইচটিএনএফ থেকে পালিয়ে আসা কয়েকজন পাহাড়ি যুবক কুদুকছড়িতে ইউপিডিএফ নেতাদের জানায় সেনা গোয়েন্দারা তাদেরকে কেবল লোকজনকে অপহরণ করতে চাপ দিয়ে থাকে। সন্ত্রাসীদের অন্য একটি দল থাকে খাগড়াছড়ি - চট্টগ্রাম সড়কের ধারে তিনট্যাহরি আনসার ক্যাম্পের কাছে সেটলার পাড়ায়। সেখান থেকেই তারা সন্ত্রাসী তৎপরতা চালায় তাদের গডফাদারদের নির্দেশে। গত ৮ অক্টোবর তারা পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে লুটপাট চালায় ও লোকজনকে হুমকি ধামকি দেয়। তাদের উৎপাতে পাহাড়ি বাঙালি সাধারণ জনগণের জীবন বর্তমানে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। জাতীয় বেঈমান সন্ত্র লারমার দলের সাথেও সিএইচটিএনফ সন্ত্রাসীদের যোগসাজশ রয়েছে। তার এক বিশ্বস্ত প্রতিনিধি মাঝে মধ্যে তাদের সাথে দেখা করে টাকা পয়সা ও প্রয়োজনীয় ব্রিফিং দিয়ে থাকে।

রুই খই মারমার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা

আজ সবার প্রশ্ন সেনা-সন্ত্র চক্র এই নব্য মুখোশ বাহিনী সিএইসটিএনএফ সন্ত্রাসীদের দিয়ে কি চায়? তারা চায় তাদেরকে দিয়ে ভয় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সাধারণ জনগণকে দমিয়ে রাখতে ও আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করতে। ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে যাতে সংগঠিত গণপ্রতিরোধ গড়ে উঠতে না পারে, যাতে জনগণ নিজেদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে, যাতে সেনা নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হতে না পারে সেজন্য সিএইচটিএনএফ গুন্ডাদের লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। আর যারাই জনগণের পক্ষে কথা বলতে চায়, নির্যাতন ও ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চায় তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হচ্ছে।

কিন্তু গণশত্রু, জাতীয় বেঈমান ও দালাল বদমাশদের জানা দরকার ষড়যন্ত্র চক্রান্তের জাল বুনে, খুন করে ও দমন পীড়ন চালিয়ে জনগণের আন্দোলন দমন করা যায় না। গত এগার বছরে ইউপিডিএফ-এর দুই শতাধিক সদস্য ও সমর্থককে খুন করে এবং বহু জেল জুলুম ও নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়েও এই পার্টিকে নির্মুল করা যায় নি, ভবিষ্যতেও যাবে না। বরং জনগণের শত্রুরাই একে একে ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ ইউপিডিএফ সাধারণ কোন সংগঠন নয়। ইউপিডিএফ হলো নতুন যুগের পার্টি, যা উন্নততর মতাদর্শ ও কঠোর শৃঙ্খলার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

রুই খই মারমাকে খুন করা হয়েছে, তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না -- এ কথা সত্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে ঘাতকরা তার আদর্শকে, পার্টির আদর্শকে খুন করতে পারেনি। এই আদর্শ চির সঞ্জীব, এই আদর্শকে ধারণ করে আরো শত সহস্র সহযোদ্ধা জন্ম নেবে। জনগণের অধিকারের পক্ষে যারা লড়াই করে যারা শহীদ হন, তাদের রক্ত বৃথা যায় না, বৃথা যেতে দেয়া হয় না; তাদের রক্ত বীজ থেকে জন্ম নেয় অসংখ্য বিপ্লবী।

সরকার-সেনা কর্তৃপক্ষ, সন্ত্রাসী বোরখা পার্টি ও তাদের গডফাদারদের প্রতি পরামর্শ: অতীত থেকে শিক্ষা নাও। ১৯৯৫ - ৯৬ সালে মুখোশ বাহিনী দিয়ে তিন গণতান্ত্রিক সংগঠন পাহাড়ি গণ পরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনকে দমন করা যায়নি। বরং সেনা সৃষ্ট এই মুখোশরাই তাদের গডফাদারবাসহ সমূলে ধ্বংস হয়েছে। অপরদিকে, এই তিন সংগঠন আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় নতুন পার্টি ইউপিডিএফ-এর জন্ম দিয়েছে। সিএইচটিএনএফ নামক নব্য মুখোশ বাহিনীকে দিয়েও ইউপিডিএফ-কে ধ্বংস করা যাবে না। বরং ইউপিডিএফ পোড় খেয়ে ভবিষ্যতে আরো অধিক শক্তিশালী হয়ে আবির্ভূত হবে। সন্ত্র-সন্ত্রাসী ও বোরখা পার্টি গুন্ডাদের দিয়ে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই, জনগণ আর সেসব ভয় পায় না। বরং যারা গণশত্রু, জাতীয় বেঈমান, জনগণের নির্যাতনকারী তাদের পরিণাম-ই অত্যন্ত করুণ হতে বাধ্য। নিরীহ জনগণের ওপর অত্যাচার চালিয়ে কেউ রেহাই পায়নি, ভবিষ্যতেও পাবে না। এখানে আরো একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, অতীতে লক্ষিছড়িতে বহু সেনা কমান্ডার জনগণের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে, বহু হম্বিতম্বি করেছে। কিন্তু শেষে তাদেরকে জনগণ ও পার্টির সদস্যদের কাছে ক্ষমা চেয়ে অশ্রুপাত করে করুণভাবে বিদায় নিতে হয়েছে। কাজেই যারা এখন নিরীহ জনগণের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে তারা সতর্ক না হলে পরিণাম অত্যন্ত খারাপ হতে বাধ্য।

দেশের উগ্রজাতীয়তাবাদী শাসকগোষ্ঠি পাহাড়ি জাতিসমূহকে চিরদিন পদানত রেখে শাসন শোষণ জারি রাখতে চায়। সেজন্য তারা ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি প্রয়োগ করে আন্দোলনকারী শক্তিগুলোর মধ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে থাকে, সেজন্য সন্ত্র চক্রের মতো জাতীয় বেঈমান ও বোরখা পার্টির মতো নব্য মুখোশ বাহিনী সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু যারা সংগ্রামী, যারা নিপীড়ন নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে চায়, তাদেরকে এই সব প্রতিক্রিয়াশীলদের মোকাবিলা করেই অগ্রসর হতে হয়। এছাড়া অন্য কোন সহজ পথ খোলা নেই। তাই বাঁচতে হলে এই নব্য মুখোশ বাহিনী তথা বোরখা পার্টি ও তাদের গডফাদারদের প্রতিরোধ করতেই হবে। এরা যতই হম্বিতম্বি করুক, ভেতরে ভেতরে এরা অত্যন্ত দুর্বল। যে অন্যায় করে, যে নিরীহ লোকজনের ওপর অত্যাচার চালায় সে দুর্বল না হয়ে পারে না।

রুই খই মারমা নিপীড়িত জনগণের মুক্তির যে স্বপ্ন দেখে গেছেন সেই স্বপ্নের কোন মৃত্যু নেই। যে আকাঙ্খা বুকে ধারণ করে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, সেই আকাঙ্খা চিরঞ্জীব -- শত সহস্র মানুষের মিলিত সংগ্রামী চেতনার প্রতিধ্বনি। তাই তাকে খুন করার পর এই গণশত্রুরা বাংলা ফিল্মের ভিলেনের মতো দানবীয় হাসি হাসতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে তাদের সেই হাসি অচিরেই নারকীয় কান্নায় মিলিয়ে যাবে। আন্দোলনে জনগণই হলেন আসল নায়ক এবং তারাই শেষ হাসি হেসে থাকেন। এটাই ইতিহাসের অপরিবর্তনীয় ও অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। রই খই মারমা অমর হোন। ■

১ম বর্ষ । ১ম সংখ্যা । ১ ফেব্রুয়ারী ২০১০ । জাতীয় বার্তা

চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে ভাওতাবাজি বন্ধ হবে কবে?

অশ্বিনী কুমার ত্রিপুরা

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার দিন বদলের অঙ্গীকার দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। জনগণের কাছে তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনেক। পার্বত্য চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন করবে বলেও আওয়ামী লীগ লিখিত ও মৌখিক অঙ্গীকার ছিল। সরকার গঠনের পরও প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য মন্ত্রীরা বহুবার ঐ একই অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু তাদের চুক্তি বাস্তবায়ন ঐ অঙ্গীকার ও মুখের কথাতেই শেষ, বাস্তবে গত এক বছরে চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি নেই। অবশ্য তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। আওয়ামী লীগসহ বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলোর ইতিহাস হলো ভাওতাবাজি, প্রতারণা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ইতিহাস। কেবলমাত্র ভূমি কমিশন গঠনে যদি ১২ বছর সময় লাগে, তাও নামমাত্র, ক্ষমতাবিহীন, কাগুজে কমিশন, তাহলে চুক্তি সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হতে কত যুগ লাগবে? এই ১২ বছরে পর পর মোট ৪ জনকে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারা কোন কাজ করতে পারেননি। ১৯৯৯ সালের ৩ জুন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে সর্বপ্রথম পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন গঠন করা হয়। কিন্তু তিনি দায়িত্ব গ্রহণের আগে ১৯৯৯ সালের ৬ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। ২০০০ সালের ৫ এপ্রিল অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আবদুল করিমকে চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়া হলে তিনি শারিরীক অসুস্থতার কারণে পদত্যাগ করেন। বিগত জোট সরকার ২০০৪ সালের ১ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এএম মাহমুদুর রহমানকে চেয়ারম্যান করে তিন বছরের জন্য পার্বত্য ভূমি কমিশন গঠন করে। বর্তমান সরকার গত জুলাই মাসে হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে চেয়ারম্যান নিয়োগ দিয়ে এ কমিশন পুনর্গঠন করে। দেখা যাচ্ছে, কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করতেই ১২ বছর শেষ।

গোপালভাঁড় তিনটি লম্বা বাঁশ পুঁতে তার মাথায় হাঁড়ি বসিয়ে দিয়ে সামান্য জাল দিয়ে অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ আগুনের তাপে ভাত রান্না করছিলেন। রাজাকে উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য গোপালভাঁড় সেটা করলেও, তার চড়ানো চাল যেমন কোন সময়ই সিদ্ধ হবার নয়, তেমনি সরকার যেভাবে চুক্তি বাস্তবায়ন করছে তাতে কোন সময়ই চুক্তি বাস্তবায়ন হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। মাঝেমধ্যে চুক্তি বাস্তবায়নের কাজ করা হচ্ছে বলে একটা ভাব দেখানো হয়। কিন্তু সেটা কোন কাজের কাজ নয়, সবই লোকদেখানো ও ভাওতাবাজি। এভাবে "বাস্তবায়ন করছি করছি" বলে আওয়ামী লীগ পূর্বের মতো এবারও তার ক্ষমতার মেয়াদ পার করে দেবে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

অপরদিকে, জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপ নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেই হিমশিম খাচ্ছে, চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যেতে তার আগ্রহ ও সামর্থ্য কোনটাই। তাছাড়া রয়েছে আঞ্চলিক পরিষদের গদি হারানোর ভয়। চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকার বিরোধী আন্দোলন করা আর গদি রক্ষা একসাথে হয় না। এখানে যে কোন একটা বেছে নিতে হবে। সন্তু লারমা গদি রক্ষার পথই বেছে নিয়েছেন। আদতে তিনি কোন সময়ই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন করেননি, ভবিষ্যতেও করবেন না। পার্বত্য চট্টগ্রামে তার মতো দালাল নেই যে সকল সরকারের আমলে গদি ঠিক রাখতে পেরেছেন। শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা পৃথিবীতে এ ধরনের গদি রক্ষায় পারঙ্গম দালাল পাওয়া যাবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড-এ এ বিষয়ে তার নাম সংযোজিত হতে পারে।

তবে চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে আন্দোলনে না গেলেও সন্তু বাবু একটা ব্যাপারে ভয়াবহ রকমভাবে আপোষহীন। আর তা হলো ইউপিডিএফ ও জনসংহতি সমিতির অপর পক্ষের সাথে ঐক্য ও সমঝোতা বিষয়ে। ইউপিডিএফ চুক্তি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে বলে বার বার ঘোষণা দেয়ার পরও সন্তু গ্রুপ তার "ধর-মার-কাট" নীতি বদলায়নি। অবশ্য আগের মতো তিনি ধরতে ও মারতে পারছেন না। এখন অনেক কিছুই তার সীমিত হয়ে আসছে -- বয়স, এলাকা, জনসমর্থন, অর্থ, লোকবল ও মনোবলসহ সবকিছু। তার গতি এখন গভীর খাদে পতনের দিকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিকার আদায়ের আন্দোলনে যে লোকটি সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে সে হলো সন্তু বাবু। যথাসময়ে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এখানে শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে যে, জনগণের আন্দোলনে ক্ষতি করেছে বলেই প্রত্যেকটি সরকার তার পুরস্কার হিসেবে তাকে গদিতে বসিয়ে রেখেছে এবং তাকে ঠেস দিয়ে রেখেছে যাতে তার চূড়ান্ত পতন না হয়। তার গদি না হারানোর একমাত্র ব্যাখ্যা হলো এটাই। তাই হলফ করে বলা যায়, আজ সরকারের বিরুদ্ধে তিনি প্রকৃত আন্দোলনে নামলে কালই তার গদি চলে যাবে। তবে সরকার তাকে ঠেস দিয়ে রাখলে রাখতে পারে, কিন্তু তার দালালীর কার্যকারীতা জনগণের আন্দোলনের মুখে অচিরেই ফুরিয়ে যাবে, যেভাবে সমীরণের মতো রাজনৈতিক বেশ্যাদের দিন ফুরিয়ে গেছে।

এবার আসা যাক দিন বদলের কথায়। সত্যি, ক্ষমতায় আসার পর গত এক বছরে আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতার দিন বদল হয়েছে, ভাগ্য ফিরেছে, চেহারাও হয়েছে নাদুস নুদুস। কিন্তু দেশের আপামর জনগণের কিছুই হয়নি। তারা অবস্থা হয় আগের মতো নতুবা তার চেয়েও খারাপ হয়েছে। সরকার তার অঙ্গীকারের কোন কিছুই পূরণ করেনি। পূরণের চেষ্টাও করেনি। যেমন "ক্রসফায়ার" বন্ধের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি সত্বেও তা আগের মতোই চলছে। প্রায় প্রতিদিন এভাবে বিচার ছাড়া মানুষ হত্যা করা হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিও একই আছে। কোন কিছু বদলায়নি। আগে যেভাবে জেলা পরিষদসমূহ পুনর্গঠনের নামে নিজের পার্টির লোকজনকে নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে, এবারও তাই করা হয়েছে। সরকার রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলা পরিষদে তার পছন্দসই লোকদের বসিয়েছে। খাগড়াছড়িতেও তাই করা হবে। উন্নয়ন বোর্ড ও শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সেও নিয়োগ দেয়া হয়েছে দলীয় এমপিদের। আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের কর্মিদের চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজি আজ পূর্বের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

অপরদিকে, আঞ্চলিক পরিষদে সন্তু লারমাকে বহাল তবিয়তে রাখা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে খুনের মামলা, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির এন্তার অভিযোগ রয়েছে। ঢাকা থেকে যে সব সরকারী বরাদ্দ আসে তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তিনি তার সশস্ত্র গ্রুপগুলোকে রক্ষণাবেক্ষন ও অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহে ব্যবহার করে থাকেন। সরকার এ ব্যাপারে অবহিত হলেও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় না। কারণ সরকার চায় পাহাড়ি জনগণের মধ্যে চিরদিন দ্বন্দ্ব, খুনোখুনি চলতে থাকুক।

২৯ জুলাই এক ব্রিগেড সৈন্য সরানোর ঘোষণা দেয়া হলেও সেটা লোকদেখানো ব্যাপার ছাড়া কিছুই ছিল না। ঘোষণার পর দু একটা এলাকা থেকে কতিপয় ক্যাম্প সরিয়ে নেয়া হয়েছে সত্য, কিন্তু সেসব অস্থায়ী ক্যাম্পের সৈন্যদেরকে বিভিন্ন জোন সদর দপ্তরেই স্থানান্তরিত করা হয়েছে মাত্র। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে নেয়া হয়নি। তাছাড়া, একটি ব্রিগেড তুলে নেয়ার ঘোষণা থাকলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা জানা যায়নি। পত্রিকাগুলোও প্রথমদিকে পুল-আউটের ব্যাপারে রিপোর্টিং করলেও পরে ধারাবাহিকতা বজায় রাখেনি।

মূলত এই সেনা প্রত্যাহার নিয়ে যা হয়েছে তা হলো একটা নাটক। এখানে পাত্র পাত্রীরা আগে থেকেই জানতো তাদের কার কি ধরনের অভিনয় করতে হবে। সে কারণে একদিকে সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়া হলেও, অন্যদিকে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে সেটলারদের উস্কে দেয়া হয়। বিশেষত সেনাবাহিনী ছিল সেটলারদের এই প্রতিবাদ বিক্ষোভে প্রধান মদদদাতা ও পৃষ্ঠপোষক। পত্রিকাগুলোও এ সময় স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হয় এবং সেটলারদের প্রতিনিধিত্বকারী দাবিদার সেনা মদদপুষ্ট উগ্রসাম্প্রদায়িক সংগঠন তথাকথিত সমঅধিকার আন্দোলনের ছোট একটা মিছিলের খবরও গুরুত্ব সহকারে ছাপিয়ে তাদের সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপে উদার চিত্তে সমর্থন যোগায়। অপরদিকে, দেশের তথাকথিত প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক দাবিদার দল, জোট ও সংগঠনগুলো এ সময় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে যদি সত্যিই আন্তরিক হয়, তাহলে তার সর্বাগ্রে করণীয় হলো এক. ভূমি বেদখল বন্ধ করে জরুরী অবস্থার সময় বেদখলকৃত জমিগুলো ফেরত দেয়া। দুই. অপারেশন উত্তরণ বাতিল করে পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করা ও সেনা তৎপরতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করা। তিন, সিভিল প্রশাসনে সামরিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা।

এরপর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে সরকারের যা করা উচিত তা হলো সংবিধানে পাহাড়িদের জাতিসত্তার ও নিজস্ব প্রথাগত ভূমি আইনের স্বীকৃতি দেয়া। সাংবিধানিক স্বীকৃতির মাধ্যমে পাহাড়িদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করা না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কারণ যুগ যুগ ধরে পাহাড়িরা যে জমি ভোগ দখল করে আসছে সে সব জমি "খাস" অভিহিত করে জোরপূর্বক কেড়ে নেয়া হয়েছে। ভূমির ওপর তাদের জন্মগত অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে কেড়ে নেয়া হয়েছে। বৃটিশ আমলে এই প্রক্রিয়া শুরু হলেও বাংলাদেশ আমলে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। কাজেই ভূমি সমস্যার সমাধানের প্রথম শর্ত হলো পাহাড়িদের ভূমি সংক্রান্ত এই অধিকারের স্বীকৃতি। বর্তমানে সংসদে আওয়ামী লীগের দুই তৃতীয়াংশের বেশী সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। যে কোন সময় সংবিধান সংশোধন সে করতে পারে। গত মেয়াদে ক্ষমতায় থাকার সময় না হয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকার দোহাই দেয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এবারে সে ধরনের দোহাই দেয়ার সুযোগ আর নেই।

জনগণ চায় সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে ভাওতাবাজি বন্ধ করুক। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে তার আন্তরিকতা প্রমাণে এটাই শেষ সুযোগ। ■

"আমি নিজের পরিচয় দিলে আমাকে সাথে সাথে হ্যান্ড-কাফ পরিয়ে চোখ বেঁধে দিয়ে আর্মি গাড়িতে করে লক্ষীছড়ি ক্যাম্পে নেয় এবং মারধর করে।" - আবুল কাশেম

গত ২১ অক্টোবর ঢাকায় সেগুন বাগিচায় রিপোর্টার্স ইউনিটিতে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লেঃ কঃ শরীফুল ইসলামের নির্যাতনের শিকার মোঃ আবুল কাশেম (৪৫) ও তার ছেলে মোঃ আল আমিন (২০) এক লিখিত বিবৃতি দেন। তার বিবৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ তুলে ধরা হলো:

"সেপ্টেম্বর মাসের ২৫ তারিখ সকাল ৯/১০ টার দিকে জিও শরিফ সাহেবের নেতৃত্বে দুটি গাড়িতে একদল সেনা জওয়ান আসে। আমার দোকানের পাশে অং সা প্রু'র দোকানে তাড়াহুড়ো করে নামে এবং আমার খোঁজ নেয়। আমার দোকানে এসে নাম ধরে জিজ্ঞেস করে এবং আমি নিজের পরিচয় দিলে আমাকে সাথে সাথে হ্যান্ড-কাফ পরিয়ে চোখ বেঁধে দিয়ে আর্মি গাড়িতে করে লক্ষীছড়ি ক্যাম্পে নেয় এবং মারধর করে।

"জিও শরিফ সাহেব আমার ছেলে আল আমিনের কথা জানতে চান। আমি তাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়ার কথা বলি। উনি ঐ দিন বিকেলের মধ্যে আল আমিনকে উনার সামনে হাজির করতে বলেন। আমি দু'তিন দিন সময় চাই। বিকেলের মধ্যে হাজির করতে না পারলে দোকানপাট বন্ধ করে এলাকা ছাড়তে নির্দেশ দেন। জিও সাহেব আমার সাথে একদম তুই-তোকারি করে কথা বলেন। জিও সাহেবের অভিযোগ আমরা মোবাইল ফোন মারফত ইউপিডিএফ-এর কাছে তথ্য দিই। এবং আমার ছেলে আল আমিন ইউপিডিএফ কর্মীকে হোন্ডা সার্ভিস দেয়। আমার একটা ফোনও উনি কেড়ে নেন।

পরদিন ২৬ সেপ্টেম্বর আমার পাড়ার এক প্রাক্তন মেম্বারসহ আমার স্ত্রীকে উপজেলা চেয়ারম্যানের কাছে পরামর্শের জন্য পাঠাই। অবস্থা বেগতিক দেখে আমি ঐ দিন এক কাপড়ে এলাকা ছেড়ে আজ পর্যন্ত পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

আমার ওপর জিও সাহেবের এত আক্রোশ কেন আমি চিন্তা করি। লক্ষীছড়ি আর্মি ক্যাম্পটি যেখানে তার মধ্যে সাড়ে ১২ কানি জায়গা আমার। সে বাবদ আমাকে বছরে ১১,৮৪২ টাকা দেয়া হয়। শরিফ সাহেব আসার পর ঐ টাকা চাইতে গেলে এ মাসে নয় পরের মাসে করে কাল ক্ষেপণ করতে থাকেন। ঐ টাকার জন্যই তিনি আমাকে এত নির্যাতন করছেন কিনা ভাবি। আমি যদি জায়গার ন্যায্য মূল্য অথবা জায়গার বদলে জায়গা পাই তাতেই সন্তুষ্ট। তার ভয়ে আমার সংসার তছনছ হবার উপক্রম। আমার স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছেলে-মেয়ের পড়াশুনা নষ্ট হচ্ছে। আমি স্ত্রী-সন্তান নিয়ে শান্তিতে থাকতে চাই।

আমার ছেলে আল আমিন শারীরিক নির্যাতনের শিকার। হোন্ডা সার্ভিস দিতে আমার ছেলে আল আমিন সেপ্টেম্বর মাসের ৯ তারিখ খাগড়াছড়ি যায়। ফেরার পথে ১০ তারিখ জালিয়া পাড়া পুলিশ ফাঁড়ির কাছে দু'টি আর্মি পিক-আপ তাকে ধরার জন্য অপেক্ষায় থাকে। হোন্ডা থেকে নামিয়ে তাকে থাপ্পড় মারে। ১০/১৫ মিনিট পর জিও শরিফ সাহেব আসলে তাকে কালো কাপড়ে চোখ বেঁধে হ্যান্ড-কাফ পরিয়ে আর্মি গাড়িতে তুলে নেয়। তারা তাকে অর্ধেক পথ হাঁটিয়ে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যায় এবং মারধর করে শরিফ সাহেব জিজ্ঞাসা করেন ইউপিডিএফ লোকেরা কোথায় থাকে। উনি আরও বলেন তোমার হোন্ডার পেছনের ইউপিডিএফ লোকটি কোথায়? আল আমিন জানায় জিরো মাইল থেকে উঠে আলুটিলায় নেমে গেছেন।

তারপর আবার মারধর করে শরিফ সাহেব জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এক পর্যায়ে চোখ থেকে কালো কাপড় খুলে দিয়ে হ্যান্ড-কাফ পরা অবস্থায় তাকে দিয়ে নিজ কবর খুঁড়তে বাধ্য করেন। সে কবর খুঁড়ে। কবরে ফেলানোর আগে শরিফ সাহেব আবারও হোন্ডার ৭ম পাতায় দেখুন

লক্ষিছড়ি জোন কমান্ডার শরীফের অপসারণের দাবিতে ঢাকায় নির্যাতিতদের সংবাদ সম্মেলন

গত ২১ অক্টোবর ঢাকায় রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে লক্ষিছড়ি জোন কমান্ডার লেঃ কঃ শরীফুল ইসলামকে অপসারণের দাবি জানানো হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে তার হাতে শারীরিক নির্যাতনের শিকার পাহাড়ি বাঙালি এ দাবি তুলে ধরেন। তারা লক্ষিছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারও অপসারণ দাবি করেন।

নির্যাতিতরা শরীফের বিরুদ্ধে মারধর, কারেন্টের শক দেয়া ও প্রখর রোদে বাইরে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে রাখার অভিযোগ তোলেন। ইউপিডিএফ-কে সমর্থন করা ও সহযোগিতা দেয়ার অভিযোগে তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে বলেও তারা দাবি করেন।

সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেন সেনা নির্যাতনের শিকার মরাচেঙ্গে গ্রামের রত্ন বিন্দু চাকমা (৩২), শিলাছড়ির দোকানদার মোঃ আবুল কাশেম (৪৫), তার ছেলে আল আমিন (২০), শিলাছড়ি পাড়ার পাই প্রু সাইন মারমা (৩২), নিউ হ্লা প্রু মারমা ওরফে নিং হ্লা প্রু (৩৭) ও অং সা প্রু মারমা (২৫), সুমন্ত পাড়ার বরুণ বিকাশ চাকমা, লাপোছড়ি গ্রামের মং সাজাই মারমা (২১) এবং রূপসেন পাড়ার রুমী চাকমা (২০)।

লক্ষ্মিছড়ি জোন কমান্ডার শরীফুলের বিরুদ্ধে জনপ্রতিনিধিদের ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন

গত ১৭ অক্টোবর ঢাকায় রিপোর্টার্স ইউনিটিতে লক্ষ্মিছড়ির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এক সংবাদ সম্মেলনে জোন কমান্ডার লেঃ কঃ শরীফুল ইসলাম ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরিদুল আলমকে অপসারণের দাবি জানান। তারা বলেন, "লক্ষীছড়ি এমন একটি এলাকা অতীতে আগে এখানে রাজনৈতিক বড় ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি। এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় নি। বলতে গেলে এ যাবত পাহাড়ি-বাঙালি সম্প্রীতি বজায় ছিল। অত্যন্ত দুঃখজনক ও উদ্বেগের ব্যাপার হচ্ছে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে ব্যক্তি ও বিশেষ একটি গোষ্ঠীর স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে এখানে প্রশাসনেরই ক্ষমতাধর এক কর্তা ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত রয়েছেন।"

তারা বলেন, "আমরা জনপ্রতিনিধি হয়েও নিজেরা নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে ভয় পাই। আমি রেঙ্গা চাই চৌধুরী উপজেলা চেয়ারম্যান আর মিলন চাকমা ভাইস-চেয়ারম্যান দু'জনই মাস খানেক হল এলাকা ছাড়া হয়ে আছি। অফিস-আদালতে গিয়ে কাজ করার নিরাপত্তা বোধ করি না। সর্বোপরি বলতে হয়, আমরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারছি না। অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা ত্রস্ত হয়ে থাকে কখন অপদস্থ হতে হয় এই ভয়ে। সাধারণ লোকজনের অবস্থা কোন পর্যায়ে তা সহজেই অনুমেয়। শুধু পাহাড়িরা নন, সাধারণ বাঙালিরাও সমানভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন।

"লক্ষীছড়িতে লে. কর্ণেল শরিফুল ইসলাম সেনা অধিনায়ক হিসেবে নিযুক্তি লাভের পর থেকেই এলাকায় সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং জনমনে অসন্তোষ বেড়েছে। এখানে এটা বলে রাখা দরকার যে, সব সেনা কর্মকর্তারা আবার শরিফ সাহেবের মত নন। শরিফ সাহেব একদিকে সেনা অধিনায়কের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ব্যবসায়িক প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনের ওপর প্রভাব-কর্তৃত্ব তো খাটানই, অধিকন্তু বন বিভাগের কাজও নিজে ব্যক্তিগতভাবে সম্পাদন করে থাকেন। রাজনৈতিক দল সংগঠন, ব্যবসা, জনপ্রতিনিধিদের ওপর হুকুমনামা জারি থেকে এমন কোন বিষয় বা বিভাগ নেই যেখানে শরিফ সাহেব নাক গলান না।

এরা ছাড়াও এলাকায় অনেক সাধারণ দোকানদার ব্যবসায়ী বা খেটে-খাওয়া লোকজন বিভিন্ন সময় তুচ্ছ কারণে জোন কমান্ডার শরীফের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন বলে সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয়।

জনপ্রতিনিধিরা ইউপিডিএফ নেতা রুই খই মারমা হত্যার সাথে লেঃ কর্ণেল শরীফুল ইসলামের জড়িত থাকা এবং বাঙালিদেরকে সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে উস্কানি দেয়ার অভিযোগ তুলেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রেঙ্গাচাই চৌধুরী, চেয়ারম্যান, লক্ষ্মিছড়ি উপজেলা, মিলন চাকমা, ভাইস চেয়ারম্যান, লক্ষ্মিছড়ি উপজেলা, সুমীতি কুমার চাকমা, চেয়ারম্যান, ১নং লক্ষীছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ, মংক্য চিং মার্মা, চেয়ারম্যান, ২নং দুল্যাতলী ইউনিয়ন পরিষদ, স্বপন চাকমা, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, ৩নং বর্মাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ, লেলিন কুমার চাকমা, ঠিকাদার সমিতি, সাংগঠনিক সম্পাদক, লক্ষীছড়ি শাখা, আওয়ামী লীগ।

আবুল কাশেম

৬ষ্ঠ পাতার পর

পেছনের লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে আল আমিন খাগড়াছড়ি ফল বাজারে তাকে নামিয়ে দেয়ার কথা জানায়। তারপর শরিফ সাহেব আল আমিনকে লাথি মেরে কবরে ফেলে দিয়ে গলা সমান মাটি দেন। এবং আবারও জিজ্ঞেস করতে থাকেন। আল আমিন একই উত্তর দিলে, কবর থেকে তুলে জওয়ানদের হাতে তুলে দিয়ে লাঠি দিয়ে পিঠাতে বলেন। লাঠি এবং বন্দুকের বাট দিয়ে মারে।

তারপর সেনা জওয়ানরা গভীর জঙ্গল থেকে আল আমিনকে হাতিমুরার এক মাটির গুদাম ঘরে নিয়ে আসে। সেখানে শরিফ সাহেব এসে পৌঁছালে গুদাম ঘরের পাহাড়ি-বাঙালির একটি দল আল আমিনকে আক্রমণ করে ১০০০ টাকা কেড়ে নেয়। ১০ সেপ্টেম্বর সকালে আল আমিনকে মানিকছড়ি ক্যাম্পে নিয়ে এসে হ্যান্ড-কাফ ও চোখের কালো কাপড় খুলে দিয়ে গোসল করানোর পর ইউপিডিএফ-এর আস্তানা সম্পর্কে আরেক দফা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাকে পিস্টল দিয়ে ছবি তুলে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর ভয় দেখানো হয়। তাকে ছেড়ে দেবার আগে সেনা জওয়ানরা হোন্ডার হেডলাইট ও সিগনেল লাইট ভেঙে দিয়ে পেট্রোল ট্যাঙ্কে ইট ঘষে দেয়। লোকে জিজ্ঞেস করলে সন্ত্রাসীরা আক্রমণ করে ভেঙে দিয়েছে বলতে বাধ্য করায়।

পাহাড়িদের জমি বেদখল করে স্বর্গভূড়া পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণের প্রতিবাদে বান্দরবান প্রেস ক্লাবের সামনে মানব বন্ধন। ১১ জানুয়ারী ২০১০।

ধর্ষণ চেষ্টার প্রতিবাদে ঘিলাছড়িতে নারীদের উত্থান

১ম পাতার পর

দেয়ার কথা থাকলেও গত দুই মাসেও জানা যায়নি সেই তদন্তের কি হলো।

সেনা তৎপরতা

প্রথম থেকেই ধর্ষণ প্রচেষ্টার ঘটনা ধামাচাপা দেয়া ও আন্দোলনকে ছলে বলে কৌশলে স্তব্ধ করে দেয়ার চেষ্টা ছিল লক্ষণীয়। তিন দিনের মধ্যে দোষী সেনা সদস্যকে শাস্তি দেয়ার সামরিক-বেসামরিক প্রতিশ্রুতি ছিল মেকি ও ভাওতাবাজি। ঘিলাছড়ির নারীদের আন্দোলন থেকে নিরস্ত রাখার জন্যই এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতির আশ্রয় নেয়া হয়েছিল। রাঙ্গামাটি রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবদুল্লাহহিল বাকী ৯ নভেম্বর এক প্রেস ব্রিফিং-এ ধর্ষণ প্রচেষ্টার ঘটনার "সত্যতা প্রশ্নসাপেক্ষ" উল্লেখ করে একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে "পরিস্থিতি ঘোলাটে" করা ও "নোংরা রাজনীতি করার অপচেষ্টায় লিপ্ত" থাকার অভিযোগ উত্থাপন করেন। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও ছলচাতুরীর পাশাপাশি ভয়ভীতি দেখিয়ে আন্দোলনকারী নারীদের জব্দ করারও চেষ্টা করা হয়। ১১ নভেম্বর রাত থেকে ঘিলাছড়ি, কুদুকছড়ি ও বগাছড়িতে শত শত সেনা সদস্য মোতায়েন করা হয়। পরদিন সকাল থেকে সেনা চেক পোস্টে নতুন করে চেকের নামে লোকজনকে হয়রানি করা শুরু হয়। ১৩ নভেম্বর রাতে ঘিলাছড়িতে আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী পহেলী চাকমার বাসাসহ প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান অমর জীবন চাকমা ও রামহরি পাড়ায় জনৈক মেম্বারের বাসায় সেনা সদস্যরা হানা দেয়। কিন্তু তাদের এসব কৌশল বুমেরাং হয়ে দেখা দেয়।

দাবি পূরণ না হওয়ায় ঘিলাছড়ির অকুতোভয় নারীরা আবার আন্দোলন শুরু করেন। ১৬ নভেম্বর তারা এক সমাবেশে মিলিত হন এবং পরদিন থেকে নতুন করে শক্তিপূর্ণ সড়ক অবরোধের ডাক দেন। এই দ্বিতীয় দফায় এক নাগারে ৪ দিন ধরে খাগড়াছড়ি-রাঙ্গামাটি সড়কে অবরোধ দেয়া হয়। এ সময় গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে সকল ধরনের যান চলাচল বন্ধ থাকে।

এবারও সেনাবাহিনী অবরোধ ভেঙে দেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালায়। পুরো এলাকায় সেনা মোতায়েন করে ভীতিমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। তারা কুদুকছড়িতে অবরোধকারী নারীদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে ১৫ জনকে আহত করে। তিনজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় রাঙ্গামাটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে এদের একজনকে চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়।

এরপরও আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হয়ে সেনারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার ষড়যন্ত্র চালায়। তারা কতিপয় সেটলার স্কুল ছাত্রকে অবরোধকারীরা মারধর করেছে বলে গুজব রটায় ও সেটলারদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধাতে উস্কানি দেয়। কয়েক শত সেটলার রাস্তায় বের হয়ে হাঙ্গামা শুরু করে এবং দুই নিরীহ পাহাড়ি পথচারীকে মারধর করে। তাদের একজনকে মুমূর্ষু অবস্থায় রাঙ্গামাটি নিয়ে যাওয়া হয়। শুধু তাই নয়, সেনারা তাদের প্রহরায় সেটলারদেরকে ঘিলাছড়ির দিকে নিয়ে আসে। কিন্তু পুরো এলাকাবাসী তাদের প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিলে সেটলাররা ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

দেয়ালে পিঠ ঠেকেছে

পাহাড়ি নারীরা কেন এত মরিয়া হয়ে আন্দোলনে নেমেছে? আসলে যুগ যুগ ধরে তারা নিপীড়ন নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে। বিশ্বের যে কোন সামরিক-কবলিত এলাকায় নারীরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামও তার ব্যতিক্রম নয়। এক কথায় তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। ঘিলাছড়ি নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা কমিটির প্রকাশিত লিফলেটে বলা হয়েছে, "পার্বত্য চট্টগ্রামে আমাদের পাহাড়ি নারীদের কোন নিরাপত্তা নেই। আমরা স্কুলে যেতে পারি না, ক্ষেতে খামারে কাজ করতে পারি না, নদী-ঝরণা থেকে পানি আনতে কিংবা স্নান করতে পারি না, মন্দিরে যেতে পারি না, আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যেতে পারি না, মাঠে গরু চড়াতে পারি না, চাকুরী করতে পারি না, এমনকি এখন নিজ বাড়িতে থাকতে পারছি না, আমাদেরকে যখন তখন যেখানে সেখানে শ্লীলতাহানি করা হচ্ছে। কতিপয় নরপিশাচ সেনা সদস্য ও সেটলার আমাদের ধর্ষণ করার জন্য সব সময় ওঁৎ পেতে থাকে। এমনকি ৪/৫ বছরের শিশু ও প্রতিবন্ধী অসহায় মহিলারা পর্যন্ত তাদের এই যৌন হামলা থেকে বাদ যায় না। অনেক সময় ধর্ষণের পর জবাই করে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। এমনকি আমরা যখন এদিকে ধর্ষণ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সড়ক অবরোধ করছিলাম, সেদিনই পানছড়িতে শুকর আলী নামে এক সেটলার সবিতা ত্রিপুরাকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়।"

তারা আরও বলেছে, "প্রতিরোধ করা ছাড়া আমাদের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই। জীবন্মৃত অবস্থার চাইতে লড়াই করে জীবন দেয়া অনেক ভালো। আমরা অতীতে অনেক তদন্ত কমিটি দেখেছি। তদন্ত কমিটি হলো আন্দোলনকারী জনগণকে ঘুমপাড়িয়ে রাখার কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। কল্পনা চাকমার অপহরণ তদন্ত রিপোর্ট ১৩ বছর পরও এখনো আলোর মুখ দেখেনি। নান্যাচর গণহত্যার তদন্ত রিপোর্টও প্রকাশ করা হয়নি। লোগাং গণহত্যার তদন্ত রিপোর্টে হামলাকারীদের সনাক্ত করা হয়নি বরং রুদ্ধ করা হয়েছে।"

সরকার ঘিলাছড়ি নারীদের দাবি মেনে নিক বা না-নিক, তারা যে এত বড় একটা আন্দোলন করতে পেরেছে সেটাই তাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য। এই আন্দোলনের মাধ্যমে তারা জানিয়ে দিয়েছে তাদের ওপর অন্যায় অত্যাচার হলে তারা আর চুপ করে বসে থাকবে না। অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে ধর্ষণ ও ধর্ষণ প্রচেষ্টাসহ নারী নির্যাতনের বহু ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তখন বড় ধরনের কোন আন্দোলন গড়ে তোলা যায়নি। সবকিছু নীরবে হজম করতে হয়েছে। কিন্তু আর নয়। ঘিলাছড়ির ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে নারীরাও প্রতিবাদ ও আন্দোলন করতে জানে। তাদেরকে আর অবলা দুর্বল ভাবার দিন শেষ হয়েছে। অচিরেই তারা আন্দোলনে এক অদম্য শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে। ঘিলাছড়ির নারীদের এই মহান আন্দোলন থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রামব্যাপী আরো বড় ধরনের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কারণ আন্দোলন ছাড়া মুক্তি কোন পথ নেই।

কিন্তু এই আন্দোলনে একটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় দিক হলো, ঘিলাছড়ি নারীদের এই ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের সাথে জনসংহতি সমিতির সঙ্ঘ গ্রুপের একাত্ম হতে না পারা। তারা অন্ততঃ বিবৃতি দিয়ে আন্দোলনকারী নারীদের সাথে সংহতি জানাতে পারতো। কিন্তু তা তারা করেনি। একটি দৈনিক পত্রিকার সাথে সাক্ষাতকারে সঙ্ঘ গ্রুপের নেতা উষাতন তালুকদার বলেছিলেন তারা নাকি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তার এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ইউপিডিএফ-এর এক নেতা মন্তব্য করে বলেন, "অন্ধরা কখনো দেখতে পায় না। সঙ্ঘ গ্রুপও আসলে আদর্শিকভাবে অন্ধ বা দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী। যেহেতু তারা অন্ধ হাজার বার পর্যবেক্ষণ করলেও তারা কিছুতেই দেখতে পাবে না যে ঘিলাছড়ি নারীদের আন্দোলন হলো অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ও যৌক্তিক।"

জনসংহতি সমিতির সঙ্ঘ গ্রুপের এই অবস্থান ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত ইঙ্গিতবহ। ঘিলাছড়ি নারীদের ভাগ্যবানই বলতে হবে, কারণ সঙ্ঘ গ্রুপের লোকজন আন্দোলনে সমর্থন না করলেও অন্তত প্রকাশ্যে বিরোধীতা করেনি। কিন্তু ভবিষ্যতে যে এ ধরনের চরম প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকায় তারা অবতীর্ণ হবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অবশ্য আন্দোলনকে ভুলে গিয়ে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে রেখে তারা বর্তমানে জনগণের আন্দোলনে যে বিরাট ক্ষতি করছে সেটাও কি কম প্রতিক্রিয়াশীল?

যাই হোক, ঘিলাছড়ির আন্দোলন কখনো বৃথা যাবে না। এই আন্দোলন হবে আগামীর বহু আন্দোলনের জননী। ঘিলাছড়ির আন্দোলন দীর্ঘজীবি হোক। জয় হোক জনতার।

১ম বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা ॥ ১ ফেব্রুয়ারী ২০১০ ॥ জাতীয় বার্তা

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ৭ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্পন্ন

পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ৭ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০ - ২৪ নভেম্বর বন্দর নগরী চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত এই কাউন্সিলে তিন জেলার বিভিন্ন অঞ্চলসহ ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে কমপক্ষে ৭০০ শত জন নারী যোগ দেন। এছাড়া ছিলেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনসহ বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগঠনের শতাধিক প্রতিনিধি।

কাউন্সিল শেষে সোনালী চাকমাকে সভাপতি, কণিকা দেওয়ানকে সাধারণ সম্পাদক ও রিনা দেওয়ানকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়।

সকাল সাড়ে এগারটায় এডভোকেট ঝুলন ভৌমিক বিপুল করতালির মধ্য দিয়ে কদম মোবারক হাই স্কুলের ইসলামাবাদী মেমোরিয়াল হলে এই কাউন্সিলের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এ সময় জাতীয়, ইউপিডিএফ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, শেখ মুজিবর রহমানই পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিগত নিপীড়নের সূচনা করেন। পাহাড়ি জনগণের নিজস্ব ভূমি আইন রয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি এর স্বীকৃতি প্রদানের দাবি জানান।

সোনালী চাকমার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী পর্বে আরো বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট চট্টগ্রাম ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক মামুন, জাতীয় ছাত্র দলের চট্টগ্রাম শাখার আহ্বায়ক মোঃ আনোয়ার, পরিব্রাজক প্রগতি দলের কেন্দ্রীয় সদস্য ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স এর ছাত্রী সুমি চক্রবর্তী, নয়া গণতান্ত্রিক গণ মোর্চার নেতা রাকিব উদ্দীন, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নেতা মিঠুন চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি রিকো চাকমা ও ইউপিডিএফ রাঙ্গামাটি জেলার সংগঠক শান্তিদেব চাকমা।

খিলাছড়িতে আন্দোলনরত নারীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে সোনালী চাকমা বলেন, "পাহাড়ি নারীরা আগের চাইতে এখন বেশী নিরাপত্তাহীনতাই ভুগছেন। তারা কোথাও নিরাপদ নন। একমাত্র সেনা ও সেটেলারদের প্রত্যাহার করার মাধ্যমেই তাদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত হতে পারে।"

তিনি পাহাড়ি জনগণের ভূমি অধিকার ও জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানান।

শান্তি দেব চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামাত সব এক। তাদের মধ্যে বড় ধরনের কোন পার্থক্য নেই। বিগত প্রত্যেক সরকারের আমলেই ইউপিডিএফ-এর ওপর নিপীড়ন চালানো হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আসল সরকার হলো সেনাবাহিনী, আওয়ামী লীগ বিএনপির সরকার নয়।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতা মামুন বলেন, জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইকে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাথে যুক্ত করতে হবে। তিনি ইউপিডিএফ নেতা রুই খই মারমা হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানান।

মোঃ আনোয়ার বলেন, বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জাতিগত সমস্যার সমাধান সম্ভ ব নয়।

সুমি চক্রবর্তী আন্দোলনরত খিলাছড়ি নারীদের ন্যায্য দাবির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে তাদের প্রতিরোধ সংগ্রামকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানান।

২য় পাতায় দেখুন

গণরোষের শিকার সন্তু লারমা

॥ জাতীয় বার্তা রিপোর্ট ॥

খাগড়াছড়ি যাওয়ার পথে মাইসছড়িসহ বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক গণরোষের শিকার হয়েছেন জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের প্রধান সন্তু লারমা। গত ২৭ জানুয়ারী সকালে এ ঘটনা ঘটে। শত শত জনতা মাইসছড়িতে তার গাড়ির বহর আটকিয়ে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে তার গাড়ির কাঁচ ভেঙ্গে যায় ও তিনি আহত হন। জনতা তাকে দালাল আখ্যায়িত করে "ধর ধর" ও "দু-অ দু-অ" ধ্বনি তুলে তাকে লাঞ্ছিত করে। এ সময় তার সাথে থাকা সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা জনতাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। সন্তু লারমা পার্শ্ববর্তী সেনা ক্যাম্পে আশ্রয় নেন। পরে খাগড়াছড়ি থেকে বাড়তি পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে নিয়ে যায়।

ক্ষুব্ধ জনতা তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে মাইসছড়ি ও চংড়াছড়িসহ খাগড়াছড়ি-রাঙ্গামাটি সড়কের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে জুতা-সেন্ডেল ও "দুলা" ঝুলিয়ে রাখে। দুলা হলো বেতের তৈরি এক ধরনের ঝুড়ি, যা সাধারণতঃ জাল দিয়ে মাছ ধরার সময় ব্যবহার করা হয়। চুক্তি-পূর্ব জনসংহতি সমিতির আন্দোলনের সময় "দুলা" সরকারের দালালের প্রতীক হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

সন্তু লারমা পার্বত্য চুক্তির পর সরকারের দালালে পরিণত হন এবং জনগণের দাবি উপেক্ষা করে সেনাবাহিনীর স্বার্থে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে রাখেন। এ জন্য জনগণ তার উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ।

নির্যাতনের বিরুদ্ধে সাজেকে নারী সমাজের ব্যাপক প্রতিরোধ

সেনা নির্যাতন, গ্রেফতার, বাড়িঘরে তল্লাশি, হয়রানি সাজেকে নিত্য দিনের ঘটনা। এর সাথে রয়েছে সেটলার কর্তৃক ভূমি বেদখল। এই সব অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খোলার সাহস পেতো না। প্রতিবাদ করতে চাইলেই তার ওপর নেমে আসতো অকথ্য সেনা নির্যাতন। বাঘাইহাটের সেনা জোনে কত নিরীহ লোকজনকে ধরে এনে মারধর করা হয়েছে তার হিসাব কেউ জানে না।

কিন্তু আজ সাজেকের জনগণ সংগঠিত। তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে সাজেক নারী সমাজ নামে পাহাড়ি নারীদের একটি সংগঠন। গত বছর ২৬ ডিসেম্বর এই সংগঠনটির জন্ম। গত ৫ জানুয়ারী সাজেকবাসী বাঘাইছড়ির ইউএনও-র কাছে ভূমি বেদখল ও সেনা নির্যাতন বন্ধ করাসহ ছয় দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি দেয়। এরপর ৮ জানুয়ারী এক সমাবেশে সাজেক নারী সমাজ পরবর্তী ১৫ জানুয়ারীর মধ্যে তাদের দাবি মেনে নেয়া না হলে বাঘাইহাট বাজার বয়কটের ঘোষণা দেয়। এদিন তারা বাঘাইহাট বাজারসহ এলাকায় ব্যাপক পোস্টার লাগায় এবং সেনাবাহিনীর আরোপিত হয়রানিমূলক গাড়ি-যাত্রীদের নামার নিয়ম লঙ্ঘন করে। এতদিন ধরে বাঘাইহাট জোনের কাছের চেকপোস্টসহ বেশ কয়েকটি চেকপোস্টে যাত্রীদের গাড়ি থেকে নেমে দুই তিন শ' গজ হেঁটে যেতে বাধ্য করা হতো। সাজেক নারী সমাজের কর্মিরা এ নিয়ম অমান্য করে।

সরকার ১৫ জানুয়ারীর মধ্যে তাদের দাবি মেনে না নেয়ায় সাজেক নারী সমাজ ১৮ জানুয়ারী থেকে বাঘাইহাট বাজার বয়কট শুরু করে। এতে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। সেনা নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদের সংগঠিত প্রতিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে গত ২১ জানুয়ারী। এদিন দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সেনারা বাঘাইহাট বাজার থেকে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগামের বিলি করা চাল নিতে আসা রেতকাবা গ্রামের কালাবিজা চাকমা ও কর্ণজয় চাকমা নামে দুই ব্যক্তিকে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে মারধর করে। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে সাজেক নারী সমাজের শত শত কর্মি বাঘাইহাট জোন ঘেরাও করে এবং গোল ঘর থেকে উক্ত দুই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। এ ঘটনার পর হতভম্ব সেনারা বিকেল সোয়া চারটার দিকে গঙ্গারাম দোরের লালুমনি বাজারে গিয়ে তাণ্ডবলীলা চালায়। তারা সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্র এলোপাথারিভাবে পাহাড়িদের মারধর করতে থাকে। সেনাদের এ হামলায় লুজোমুখী চাকমা নামের এক নারীসহ দশ নিরীহ পাহাড়ি আহত হয়। এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে সাজেক নারী সমাজ ঘটনাস্থলেই প্রতিবাদ জানায়। তাদের প্রতিবাদের মুখে সেনারা সেখান থেকে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়, তবে তারা সন্ধ্যার দিকে রেতকাবা মুখ দোকানে হানা দিয়ে নিরীহ গ্রামবাসীদের মারধর করে। এরপর রাতে সেনারা সেটলারদের নিয়ে আবার রেতকাবা গ্রামে হানা দেয় ও বাড়িঘরে ব্যাপক লুটপাট চালায়।

সাজেকে হামলার প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে লাঠি মিছিল

সাজেকে এই হামলার প্রতিবাদে খাগড়াছড়িসহ বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দিঘীনালায় ২৪ জানুয়ারী সড়ক অবরোধ পালিত হয়। শান্তিপূর্ণ সড়ক অবরোধ চলাকালে তথাকথিত বাঙালি ছাত্র পরিষদের কর্মিরা বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। তারা বাঘাইহাট হাই স্কুলের শিক্ষকসহ বেশ কয়েকজন পাহাড়িকে মারধর করে এবং ঐ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সারাদিন জিম্মি করে রাখে। এর প্রতিবাদে ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি শহরে লাঠি মিছিল বের করে। ২৪ জানুয়ারী রাতে সেনারা সাজেকে পাহাড়িদের গ্রাম থেকে দুই ব্যক্তিকে ধরে নেয়ার চেষ্টা করলে নারীরা সংঘবদ্ধভাবে সেনাদের কাছ থেকে তাদের ছিনিয়ে নিয়ে আসে।

সাজেক নারী সমাজের নেত্রীরা বলেন, তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকেছে। প্রতিরোধ করা ছাড়া তাদের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই। বাঘাইহাট আর্মি জোন প্রত্যাহারসহ তাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। বাজার বয়কটও চলবে।

তারা বলেন, সেনাবাহিনীর নির্যাতন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তারা প্রশ্ন রাখেন সেনাবাহিনীর কাজ কি? তাদের কাজ কি গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে নিরীহ পাহাড়িদের মারধর করা? এ জন্যই কি তাদেরকে বেতন দেয়া হচ্ছে, ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে? তাদের কাজ কি সেটলারদেরকে দিয়ে আমাদের জমি জবরদখল করা? আমাদের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করা? বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা হলো চরমভাবে বর্ণবাদী ও পাহাড়ি বিদ্বেষী। তারা সব সময়ই সেটলারদের পক্ষ নেয় এবং পাহাড়িদের শত্রু জ্ঞান করে।

"কিন্তু আমরা আর সহ্য করবো না। আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাবো। আমাদের বিজয় হবেই, কারণ আমাদের আন্দোলন ন্যায়সঙ্গত।"

বান্দরবানে ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে মানব বন্ধন

॥ জাতীয় বার্তা রিপোর্ট ॥

গত ১১ জানুয়ারী বান্দরবান শহরে অব্যাহত ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুশীল সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত এই মানব বন্ধনে শত শত নারী পুরুষ অংশ নেন। সকাল সাড়ে দশটায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত এই মানব বন্ধন সোনালী ব্যাংক থেকে ডিসি অফিস পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। (ছবি ৭ম পাতায়)

ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের বান্দরবান জেলা ইউনিটের সংগঠক ছোটন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা এ সময় বক্তব্য রাখেন।

তিনি পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণের নামে পাহাড়ি জনগণের ভূমি বেদখল বন্ধ করতে জেলা প্রশাসনের প্রতি অনুরোধ জানান।

তিনি বলেন, "আমরা অবশ্যই উন্নয়ন চাই, কিন্তু আমরা এমন উন্নয়ন চাই না যে উন্নয়নের কারণে আমাদেরকে জমি থেকে উৎখাত হতে হয়, জীবিকার উৎস বিনষ্ট হয় এবং আমাদের সংস্কৃতি ও ভবিষ্যত আশা অনিশ্চিত হয়ে যায়। এ ধরনের কার্যক্রমকে কোন মতেই উন্নয়ন বলা যায় না।"

তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, "যদি আপনারা (সরকার) উন্নয়ন চান, তাহলে কেন পাহাড়ি হোস্টেলকে চালু করছেন না? এই হোস্টেল তো দীর্ঘ দিন ধরে খালি পড়ে আছে।"

ছোটন জনৈক বম সম্প্রদায়ের ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি বেদখল করে "স্বর্ণচূড়া" নামের পর্যটন কেন্দ্র নির্মানের কাজ বন্ধ এবং জামাতে ইসলামীর সমর্থকদের দ্বারা ২৫টি ত্রিপুরা পরিবারের জমি বেদখল রোধ করার দাবি জানান।

আনুমানিক পাঁচ শতাধিক নারী পুরুষ ব্যানার ও প্লাকার্ড নিয়ে মানব বন্ধনে অংশ নেন। তারা বান্দরবান সদর ইউএনও-র পদত্যাগ, সরকারী কর্মকর্তাদের ভূমি বেদখলের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ তদন্ত ও পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ বন্ধের দাবি জানান।